একক ৭ ❑ পাঠক্রমের ভিত্তি ঃ দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক (Basis of Curriculum : Philosophical, Psychological and Sociological)

গঠন

৭.১ সূচনা
৭.২ উদ্দেশ্য
৭.৩ পাঠক্রমের দার্শনিক ভিত্তি
৭.৩.১ ভাববাদী দর্শন ও পাঠক্রম
৭.৩.২ প্রকৃতিবাদ ও পাঠক্রম
৭.৩.৩ প্রয়োগবাদ ও পাঠক্রম
৭.৪ পাঠক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি
৭.৫ পাঠক্রমের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি
৭.৬ উপসংহার
৭.৭ প্রশ্নাবলি

৭.১ সূচনা (Introduction)

সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। তবে এই প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন মানুষের চাহিদা ও সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার লক্ষ্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই শিক্ষার ব্যক্তিকেন্দ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশসাধন করা এবং এই বিকাশের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা। তাই শিক্ষা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু এবং অনুশীলন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষা যেমন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর আত্মনির্ভরতা ও আত্মতৃপ্তি বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের গুণগতমান বৃদ্ধি করা এবং সমাজ ও ব্যবহারিক জীবনে সহায়তা করা। ফলে শিক্ষা

সামাজিক, মানসিক ও মূল্যবোধ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব যেমন দিয়ে থাকে, আবার শিক্ষা পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের সুষম বিকাশের সাহায্যে আত্মোপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নয়নের ওপরও গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ এইসব লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাঠক্রমে দার্শনিক, সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ধারণাগত ভিত্তিগুলির কার্যকরী সমন্বয় ঘটানোর ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

৭.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের—

- পাঠক্রমের ভিত্তি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা জন্মাবে।

৭.৩ পাঠক্রমের দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical Basis of Curriculum)

পাঠক্রমের প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় পাঠক্রম কখনও শিক্ষার্থীর আত্মতৃপ্তি ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি করার ওপর জোর দিয়েছে, আবার কখনও পাঠক্রম ব্যবহৃত হয়েছে সংস্কারমুক্ত জীবন প্রস্তুত করতে। ফলে দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রেক্ষাপট, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহারের ধারা নানাভাবে প্রভাবিত করেছে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে। ব্যক্তির কার্যকরী অভিযোজনের সাহায্য করার লক্ষ্য নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে পাঠক্রম গঠন ও পরিকাঠামোর প্রস্তুতিতে। জীবনদর্শন, মূল্যবোধ ও আর্দশের কথা মনে রেখে শিক্ষণপদ্ধতি, পাঠক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নানাভাবে প্রস্তুত হয় যা মানুষের মৌলিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে থাকে। মানসিক পরিতৃপ্তি, মূল্যবোধ বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে নানান দার্শনিক মতবাদের প্রভাব দেখা যায়। পাঠক্রমের ক্ষেত্রে দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব মূলত নিম্নোক্ত বিষয়ে পরিলক্ষিত হয় ঃ

(১) **পাঠক্রম নির্ণয়ে দর্শনের প্রভাব ঃ** দর্শনশাস্ত্র যেমন নিয়ন্ত্রিত করে শিক্ষার লক্ষ্য কী হবে, তেমনি পাঠক্রম নির্ণয় করে কীভাবে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে। দেশকাল ভেদে যেমন সমকালীন দার্শনিক চিন্তাধারা প্রভাবিত হয় তেমনি এই দার্শনিক চিন্তাধারাই আবার প্রভাবিত করবে কী কী বিষয় থাকবে ও কীভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপনা করা হবে। অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে পাঠক্রমকে।

(২) **পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ ঃ** বিভিন্ন দার্শনিকরা পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে নানা মতবাদ পোষণ করেন যা বিভিন্ন সময়ে দেশের পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নানা নিয়মকানুন আরোপ করে থাকে।

প্রকৃতিবাদীরা যেমন পাঠ্যপুস্তকে নানা ছবি ও উদাহরণের দিকে জোর দিয়েছেন তেমনি ভাববাদীরা গুরুত্ব দিয়েছেন লেখকের প্রকাশভঙ্গির ওপর। প্রয়োগবাদীরা মনে করেন বিষয়বস্তুর প্রায়োগিক দিকের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

(৩) **শিক্ষণ পদ্ধতি ঃ** পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর সঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া হয় পদ্ধতির পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে। যেসব পদ্ধতি আমরা দেখি সেগুলি সাধারণ বিভিন্ন দার্শনিক ভিত্তির উপর দাড়িয়ে রয়েছে। ভাববাদীদের মতে শিক্ষণ পদ্ধতি যেমন শিক্ষক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত তেমনি প্রকৃতিবাদীরা জোর দিয়েছেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতির উপর। প্রয়োগবাদীরা জোর দিয়েছেন জীবনকেন্দ্রিক বা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর।

(৪) **মূল্যায়ন ঃ** শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, পদ্ধতি-উপাদান ও পরীক্ষার যথার্থ বিচার করা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে পরিমার্জন, সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করা। শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, পদ্ধতি ইত্যাদি যেহেতু দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত তাই শিক্ষার মূল্যায়ন ও তার ফলাফল নির্ধারণ করা দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত।

পাঠক্রমের দার্শনিক ভিত্তি ঃ

শিক্ষার ক্ষেত্রে দার্শনিক মতবাদগুলি তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত। সেগুলির মধ্যে প্রধান-ভাববাদী (idealism) দর্শন, প্রকৃতিবাদী দর্শন (naturalism) এবং প্রয়োগবাদী দর্শন। এই প্রত্যেকটি দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠক্রম রচনার নীতি বিভিন্ন সময়ে স্থির হয়েছে। এইসব রীতিনীতিকে পাঠক্রমের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

৭.৩.১ ভাববাদীদর্শন ও পাঠক্রম

দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম হচ্ছে ভাববাদী দর্শন। এই দর্শনে আত্মোপলব্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই ভাববাদীদের মতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক সত্ত্বার (spiritual self) বিকাশে সাহায্য করা।

এই দলের দার্শনিকরা মনে করেন জড়জগৎ ছাড়াও আরও একটা আধ্যাত্মিক জগৎ রয়েছে। আর মানবসত্তার মূল লক্ষ্য হবে সেই জগৎ বা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। শিক্ষার লক্ষ্য সত্যকে জানা সুন্দরকে চেনা ও ভালবাসাকে উপলব্ধি করা। এককথায় ভাববাদীরা আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে জগৎ-এর সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ (truth, love and beauty) অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে সত্যকে জানা, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং নান্দনিক উপলব্ধির প্রকাশ ঘটানোই হবে পাঠক্রমের মূল লক্ষ্য।

শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক সত্ত্বার (spiritual) বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ভাববাদীরা জোর দিয়েছেন শিক্ষার্থীর নৈতিক (moral) বৌদ্ধিক (intellectual) ধার্মিক (religious) ও নান্দনিক (ethetic) বিকাশের ওপর। ভাববাদী দর্শন অনুযায়ী পাঠক্রমে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের বিকাশের ওপর।

পাঠক্রমের উপরোক্ত লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখে এখানে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। সত্যকে জানা ও এই ব্যাপারে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উদ্দেশ্যে গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে জোর দেওয়া, তেমনি আবার নৈতিক উন্নয়নের জন্য ভাষা, ন্যায়শাস্ত্র, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্ব রয়েছে। নান্দনিক ক্ষমতা বিকাশের উদ্দেশ্যে সাহিত্য, কবিতাপাঠ, কারুকলা বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা, হাতের কাজ ইত্যাদি গুরুত্ব পেয়েছে কর্ম সচেতনতা ও দৈহিক বিকাশের জন্য। ভাববাদীরা মনে করতেন উপযুক্ত স্বাস্থ্য ও দৈহিক বিকাশ ছাড়া পড়ুয়ার মধ্যে আধ্যাত্মিক বিকাশ ও কর্মসচেতনতা সম্ভব নয়। তাই ভাববাদীদের মতামতকে অনুসরণ করে পাঠক্রমে দুই প্রকারের কার্যক্রমের সংযোজন হয়—দৈহিক বিকাশসংক্রান্ত কার্যক্রম ও আধ্যাত্মিক সংক্রান্ত কার্যক্রম। ভাববাদী কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বস্তুকেন্দ্রিকতা নয়, তা হল আত্মকেন্দ্রিক আত্মোপলব্ধি। সার্বজনীন নীতিবোধ ও মূল্যবোধ এই পাঠক্রমের মূলভিত্তি। ভাববাদীদের মতানুযায়ী নৈতিক বিকাশ, বৌদ্ধিক ও ভাবময় জীবনের উন্নতিসাধন করা হবে পাঠক্রমের লক্ষ্য। তেমনিভাবে আর্দশ শিক্ষক হবেন তিনি যার জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধি রয়েছে। সবদিক থেকে ভাববাদ শিক্ষাকে সংকীর্ণতা মুক্ত করে এক সার্বজনীন আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে এখানে শিক্ষণ পদ্ধতি মূলত শিক্ষককেন্দ্রিক। শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদের যারা প্রয়োগ করেন তাদের মধ্যে কমিনিয়াস (Cominious) প্লেটো (Plato) কান্ট (Kant) পেস্তালজি (Pestalozzi) ফ্রয়েবেল (Froebel) রবীন্দ্রনাথ (Rabindranath) প্রমুখ। এরা শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মোপলব্ধি, আধ্যাত্মিক জীবন, ভাবময় জীবন ও বিশ্বমানবাত্মা বোধের বিকাশ ও উন্নয়নসাধনে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন।

৭.৩.২ প্রকৃতিবাদ ও পাঠক্রম (Naturalism and Curriculum)

ভাববাদী দর্শনের বিকল্প হিসাবে আরেক ধরনের দার্শনিক মতবাদ লক্ষ্য করা যায় যাকে বলা হয় প্রকৃতিবাদ দর্শন। এই মতবাদ অনুযায়ী বিশ্বপ্রকৃতিতে যা কিছু দেখা যায় তাই হল বাস্তব। আর বাকী সব মিথ্যা। এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকরা মনে করেন বস্তুজগতের বাইরে আর কিছু নেই। মানুষ হল এই বস্তু জগতের অংশবিশেষ। শিক্ষাক্ষেত্রে এই চিন্তার প্রয়োগ প্রকৃতিবাদী শিক্ষা দর্শন নামে পরিচিত।

রুশো এই মতবাদকে বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং পরবর্তী যুগে তার মতবাদ অনুসরণ করে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ শিক্ষাক্ষেত্রে এর কার্যকরী রূপ দেন। অবশ্য হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer), পেস্তালজি (Pestalozzi), রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন। প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী পাঠক্রমের লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশ ও আত্মসংরক্ষণে সাহায্য করা। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা নিজের প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী যাতে বিকাশ লাভ করতে পারে সেই দিকেই শিক্ষায় বিশেষ জোর দেওয়া উচিত বলে মনে করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী পড়ুয়াদের ওপর কিছু জোর করে চাপিয়ে দিয়ে শেখানো উচিত নয়। বরং শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রম নির্ধারণ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার বলে এই দলের দার্শনিকরা মনে করেন। আসলে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষার্থী যাতে নিজের চাহিদা ও উন্নয়ন ঘটাতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর দেবার কথা এই প্রকৃতিবাদী পাঠক্রমে বলা হয়েছে।

প্রকৃতিকে জানা ও প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য রেখে আত্মসংরক্ষণের দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এই পাঠক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই প্রকৃতিবাদীরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি তারই পাশাপাশি জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতাকে বিষয় হিসেবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। এরই সহায়ক হিসেবে এখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যেমন—প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদিকে আবশ্যিক পাঠ্যবিষয় হিসেবে বলা হয়েছে। প্রকৃতি ও প্রযুক্তিচর্চার সঙ্গে সঙ্গে গণিত, ভাষা, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি যাতে হয় সেদিকে প্রকৃতিবাদীরা নির্দেশ দান করেছেন।

শিক্ষার্থীরা যাতে পরিবেশ সম্পর্কে সহজে সচেতন ও সক্রিয় হতে পারে তাই পরিবেশ সমীক্ষণ, কৃষিকাজ ইত্যাদি বিষয় পাঠক্রমে সংযুক্ত করার দিকে প্রকৃতিবাদীরা বিশেষ সচেষ্ট হন। প্রকৃতিবাদী দর্শনে উন্নত মানবিক মূল্যবোধ ও গুণাবলির বিকাশে তেমন কোনো নজর দেওয়া হয়নি। প্রকৃতিবাদীরা শিক্ষার্থীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ একেবারে অগ্রাহ্য করেছেন। এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকরা পাঠক্রমের অংশ হিসেবে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলোর কথাই বিশেষ করে বলেছেন যেমন—প্রকৃতি পরিচয়, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি। প্রকৃতিবাদীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত মনোভাব, প্রেষণা ও চাহিদার গুরুত্ব যতটা দিয়েছেন সেই তুলনায় শিক্ষক, শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠক্রমের গুরুত্ব ঠিক ততটা আরোপ করেননি।

৭.৩.৩ প্রয়োগবাদ ও পাঠক্রম (Pragmitism and Curriculum)

প্রকৃতিবাদী ও ভাববাদী দর্শনের তুলনায় বাস্তবসম্মত হচ্ছে প্রয়োগবাদ দর্শন। প্রয়োগবাদের মূল কথা হল উপযোগিতা। প্রয়োগবাদীরা মনে করেন যে অভিজ্ঞতা বা ধারণা ব্যবহারিক প্রয়োগে ভালো তাই সত্য, তাই গ্রহণযোগ্য। প্রয়োগবাদে পরীক্ষকদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই মতামত অনুযায়ী পাঠক্রম, শিক্ষার্থীর জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে এমনভাবে বিষয় নির্বাচন করা দরকার। এই মতামত অনুযায়ী পাঠক্রম হওয়া উচিত কর্মভিত্তিক ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক। তা ছাড়া বিষয়গুলিকে আলাদা আলাদাভাবে উপস্থাপন না করে সমন্বয়ের নীতির ভিত্তিতে অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম রচনায় গুরুত্ব দেওয়ার কথা প্রয়োগবাদীরা বিশেষভাবে নির্দেশ করেছেন।

বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদীরা বাস্তব জীবনের সহায়ক হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি আত্মরক্ষার কৌশল, যোগাযোগ ও সমাজ সচেতনতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এই পাঠক্রমে গুরুত্ব পেয়েছে ভাষা শিক্ষা, ভূগোল, ইতিহাস, স্বাস্থ্যবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়বস্তু। এই পাঠক্রমে আবশ্যিক বিষয়ের যেমন উল্লেখ রয়েছে তেমনি ঐচ্ছিক অর্থাৎ ছাত্রদের পছন্দ মাফিক বিষয় নির্বাচনেরও গুরুত্ব রয়েছে।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ভাবধারা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে পাঠক্রম প্রস্তুত হয়েছে। এই ভাবধারাগুলির মধ্যে যেমন বৈসাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি আবার সাদৃশ্যও রয়েছে। শুধু তাই নয় একই বিষয়কে বিভিন্নভাবে দার্শনিকরা ব্যবহার করেছেন। এমনকি পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচন ও সুবিন্যস্ত করার নীতিরও তারতম্য রয়েছে। অবশ্য আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সবকটি মতবাদের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত পাঠক্রম আধুনিক শিক্ষায় সবচেয়ে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

এই তিন প্রকারের দার্শনিক চিন্তা ছাড়াও আধুনিককালে মার্কসবাদী দর্শন শিক্ষা ও পাঠক্রমের ক্ষেত্রে এক নতুনদিকের সূচনা করে। এদের প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়াই এই পাঠক্রমের প্রধান লক্ষ্য।

৭.৪ পাঠক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Psychological Basis of Curriculum)

আধুনিক শিক্ষা লক্ষ্য ও কার্যক্রম প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধন ঘটিয়েছে। তবে আধুনিক শিক্ষার কার্যকরী রূপ ও বিকাশে যে সকল বিজ্ঞান বিশেষভাবে সহায়তা করেছে, সেগুলির

মধ্যে মনোবিজ্ঞানের অবদানই সবচেয়ে বেশি বলে পরিগণিত। পাঠক্রমের মূলনীতি ও ধারণা নিয়ে ইতিপূর্বে যেসব আলোচনা করা হয়েছে তাতে বারবার শিক্ষার্থীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত উপাদান শিশুকে ঘিরে প্রস্তুত হবে এটাই স্বাভাবিক এবং পাঠক্রমও তার ব্যতিক্রম নয়। মনোবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ তথ্য ও তত্ত্বগুলি বিভিন্নভাবে পাঠক্রমের লক্ষ্য, কাঠামোও নিয়ন্ত্রণ করেছে। নীচে অনুরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হল ঃ

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ (Growth and Development of Child)

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুদের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব ছিল কম। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিশুর সঠিক বিকাশ ও বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশুর প্রজ্ঞা বিকাশের (Cognitive Development) গতি প্রকৃতির কথা চিন্তা করে সহজ থেকে কঠিন, সরল থেকে জটিল, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, দৈহিক সক্রিয়তা থেকে মানসিক সক্রিয়তার দিকে বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ ঘটানো হয়। এই নীতি অনুযায়ী পাঠক্রমে বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতার সমাবেশ শুধুমাত্র বিকাশের গতি অনুসরণ করে না। বিকাশের স্বাভাবিক গতি যাতে ব্যাহত না হয় এবং বিকাশের প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে সেদিকে পাঠক্রমে বিশেষ নজর দেওয়া হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ তত্ত্বের মাধ্যমে পাঠক্রমে প্রজ্ঞামূলক সংগঠন তথা জ্ঞানের একক, যেমন—জানা, বোঝা, প্রয়োগ করা ইত্যাদি ধাপে পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচনের নীতি নির্ধারণ হয় ; পিঁয়াজে ব্রুনা এসব মনীষীরা এই ব্যাপারে নানা মতবাদ দিয়েছেন। শুধু তাই নয় শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের কথা চিন্তা করে আধুনিককালে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির বয়স নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual Differences)

শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে দুইজন শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ এক নয়। সমস্ত শিশুদের চিন্তায় ও আচরণে অনেক সাদৃশ্য যেমন রয়েছে, তেমনি আবার রয়েছে বৈসাদৃশ্য। তারা যত বড়ো হতে থাকে ততই ব্যক্তিগত বৈষম্য প্রকাশিত হয়। পাঠক্রমে দেখা যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে শিক্ষা তার প্রকার ও প্রকরণ বিশ্বের সর্বত্রই প্রায় একপ্রকার। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ব্যক্তিগত বৈষম্যকে গুরুত্ব না দিয়ে অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়। তবে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়ার স্তরে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিভাজন (বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য ইত্যাদি) প্রস্তুত করা হয়। শিক্ষার্থীর চাহিদা, পছন্দ, অপছন্দ, বুদ্ধিবৃত্তি, বিশেষ প্রবণতা ইত্যাদি ব্যক্তি বৈষম্যের কথা চিন্তা করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠক্রমের বিষয় নির্বাচনের বিশেষ নীতি নির্ধারিত হয়েছে। ব্যক্তিগত বৈষম্যকে

কাজে লাগিয়ে পাঠক্রমের মাধ্যমে ব্যক্তির ও সমাজের উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে আধুনিক সবরকম পাঠক্রমে।

শিখনের সঞ্চালন (Transfer of Learning)

মনোবিজ্ঞানের শিখনের সঞ্চালন নীতির ওপর ভিত্তি করে পাঠক্রমের অভিজ্ঞতাগুলি এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যাতে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা পরবর্তী অভিজ্ঞতা লাভে সহায়ক হয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার আরও একটি দিক হল কোনো বিষয়বস্তু উপস্থাপনা করার পূর্বে অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিকগুলো চিহ্নিত করা ও শিক্ষার্থীর আত্মীকরণে (order of assimilation) সাহায্য করা।

এ ছাড়াও, সাধারণীকরণের তত্ত্ব (Theory of generalization) অনুযায়ী পাঠক্রমে বিষয় ও অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটানো হয় যেন শিক্ষার্থী তার সাধারণীকরণের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে একটি চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হতে পারে। এ ছাড়া পাঠক্রমের সহগতিমূলক নীতির মূল ভিত্তি সদৃশ উপাদানের তত্ত্ব (Theory of identical elesments)।

শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি, প্রেষণা, চাহিদা, মনোযোগ ইত্যাদি বহুবৈশিষ্ট্য পাঠক্রমের বিষয় নির্বাচন, শিক্ষণ পদ্ধতি, বিষয়ের উপস্থাপনা, রুটিন নির্বাচন ইত্যাদি নানা পর্যায়ে নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে।

৭.৫ পাঠক্রমের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি (Sociological Basis of Curriculum)

আধুনিককালে পাঠক্রম যেমন মনোবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। শিক্ষার সামাজিক উপযোগিতা চরিতার্থ করার পক্ষে পাঠক্রমে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতিকে নানাভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। নীচে এরকম কয়েক নীতি ও উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হল ঃ

শিক্ষার নানাপ্রকার সংজ্ঞার অন্যতম হল সমাজতান্ত্রিক সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শিশু বা শিক্ষার্থীর মধ্যেকার অন্তর্নিহিত শক্তি বা সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা ও তাকে তার পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে সাহায্য করাই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিশুর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য জন্মসূত্রে প্রাপ্ত হলেও পরবর্তী জীবনের গতি প্রকৃতি তার জীবন ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বিভিন্ন চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়। উপযুক্ত পাঠক্রম তাই শিশুর ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের চাহিদার পরিতৃপ্তির সহায়ক হিসেবে কাজ করে। শুধুমাত্র ব্যক্তিমুখী বিকাশ হলে তাতে ব্যক্তির সুপ্ত

প্রতিভার পূর্ণতা লাভ হবে ঠিক, কিন্তু শিক্ষার্থী পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন হলে তা ব্যক্তি ও সমাজ কারো পক্ষেই মঙ্গলদায়ক নয়। এই কারণে শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তার সামাজিক লক্ষ্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা যেহেতু একটি সামাজিক প্রক্রিয়া সেহেতু সমাজজীবনের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব যেমন শিক্ষায় রয়েছে আবার শিক্ষার প্রভাব সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে। তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণের মধ্য দিয়ে সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইত্যাদিকে অনুধাবন করতে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে। এইসব সামাজিক রীতিনীতি প্রতিনিয়ত সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল। শিক্ষার উদ্দেশ্য এই পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীর অভিযোজন ঘটানো। তাই শিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রমে বিষয়বস্তুর নিরন্তর পরিমার্জন, পরিশোধন ও সংযোজন ঘটে। অর্থাৎ পাঠক্রম পরিবর্তনশীল ও নমনীয় হওয়া প্রয়োজন যাতে করে ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রগতি ও উন্নয়ন অব্যাহত থাকে।

শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটানো। গণতন্ত্র একটি সামাজিক দর্শন, শুধুমাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা নয়। সুতরাং গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, প্রতিটি মানুষ যদি গণতান্ত্রিক চেতনার অধিকারী হয় তবেই গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সফল হতে পারে। আর আধুনিক পাঠক্রমে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে জোর দেওয়া হয়।

ক্রো এবং ক্রো (Crow and Crow) পাঠক্রমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, বিদ্যালয়ের ভিতর ও বাইরে শিক্ষার্থীর সমস্ত অভিজ্ঞতাই পাঠক্রমের অন্তর্গত। এইসব অভিজ্ঞতা এমন একটি কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় যাতে শিক্ষার্থীর শারীরিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশে সাহায্য করে। নৈতিকবোধ ব্যক্তিগত হলেও সমাজের ভালোমন্দে মুদালিয়র কমিশন ও কোঠারী কমিশনের সুপারিশগুলিতে এই ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। শুধু তাই নয় সামাজিক প্রয়োজনের কথা মনে রেখে পাঠক্রমে পৌরবিদ্যা (Civics), পরিবেশ বিদ্যা (Environmental studies), নীতিশিক্ষা (Ethics) প্রভৃতি নানা বিষয় শিক্ষার সামাজিক প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোঠারী কমিশন সামাজিক প্রয়োজনের কথা মনে রেখে কর্মশিক্ষা (Work education), সমাজসেবা (Social service) ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিক্ষাবিদরা পাঠক্রমের দুটি মাত্রার কথা বলেছেন। এগুলি হল—

বৌদ্ধিকমাত্রা (Intellectual dimension)—জ্ঞান আহরণ, জ্ঞানের আদানপ্রদান, নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক মাত্রা (Social dimension)—বহুবিচিত্র সামাজিক সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে পরিবার, সমাজ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পাঠক্রমে বিষয় সংযুক্তি করার ওপর বিভিন্ন কমিশন জোর দিয়েছে।

পরিশেষে, বলা যেতে পারে যে—শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যের কথা মনে রেখে পাঠক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের সংযুক্তি ঘটেছে।

৭.৬ উপসংহার (Conclusion)

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশ ঘটানো ও এই বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পাঠক্রম শিক্ষার্থীর জীবন ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার জীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সামাজিক অভিযোজন ও উন্নয়নের সার্থক রূপ দেবার চেষ্টা করে। জীবনের উৎস ও উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করা যেহেতু দর্শনের কাজ তাই পাঠক্রম জীবনদর্শন দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত। দার্শনিকরা পাঠক্রমের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়বস্তু সংশোধন করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে কখনও তারা প্রকৃতিবাদ বা বস্তুবাদের ওপর যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি আবার কখনও আদর্শবাদের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী পাঠক্রম মূলত তিনপ্রকার দার্শনিক চিন্তায় প্রভাবিত। এগুলি হল—ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ ও প্রয়োগবাদ। ভাববাদীরা পাঠক্রমের মাধ্যমে বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, নান্দনিক ইত্যাদি অর্থাৎ জ্ঞান, ধর্ম ও কর্মের উন্নয়ন ঘটানোর কথা বলেছেন। প্রকৃতিবাদীরা শিশুর নিজের প্রকৃতি চাহিদা ও ক্ষমতা অনুযায়ী পরিপূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে পাঠক্রম নির্ধারণ করার কথা বলেছেন। প্রয়োগবাদীরা মানুষের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক উপযোগিতার কথা মনে রেখে পাঠক্রম প্রস্তুত করার কথা বলেছেন।

উপরোক্ত দার্শনিক মতবাদগুলি শিক্ষার্থীর মন ও তার সামাজিক পরিবেশের ভিত্তিতে নানা ভাবধারা দিয়ে প্রভাবিত ও পরিকল্পিত। তাই পাঠক্রমে মনোবিজ্ঞানের ও সমাজবিজ্ঞানের নীতিগুলো বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলেছে। তাই পাঠক্রম রচনার সময় শিক্ষার্থীর বিকাশ, বৃদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, ক্ষমতা, প্রবণতার কথা ইত্যাদি যেমন মনে রাখা দরকার ; তেমনি পাঠক্রমের এই ব্যক্তিমুখী নীতির সাথে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, রীতিনীতি, আত্মীকরণ ও সমাজায়নে অনুপ্রাণিত করার কথা ভাবাও সমানভাবে প্রয়োজন। সঠিক পাঠক্রমে দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক নীতির কার্যকরী সমন্বয় প্রতিফলিত হয়।

৭.৭ প্রশ্নাবলি (Questions)

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay type Questions)

১। পাঠক্রমের ভিত্তি বলতে কী বোঝায়? দর্শন কীভাবে পাঠক্রমকে প্রভাবিত করেছে?

২। পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ আলোচনা করুন।

৩। ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদ দর্শন অনুযায়ী পাঠক্রমের লক্ষ্য কী? ভাববাদী ও প্রয়োগবাদী দর্শনের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। পাঠক্রম রচনার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিগুলি কীভাবে পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করা হয় তা আলোচনা করুন।

৫। পাঠক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

৬। পাঠক্রম ও সমাজের মধ্যেকার সম্পর্ক কী? পাঠক্রমের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করুন।

৭। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

(ক) ভাববাদী দর্শন ও পাঠক্রম।

(খ) প্রয়োগবাদ দর্শন অনুযায়ী পাঠক্রম।

(গ) প্রকৃতিবাদ দর্শন অনুযায়ী পাঠক্রমের বিষয়বস্তু।

(ঘ) পাঠক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি।

একক ৮ ❑ শিখনের তত্ত্ব ও পাঠক্রম (Theories of Learning and Curriculum)

গঠন

৮.১ সূচনা

৮.২ উদ্দেশ্য

৮.৩ শিখনের বৈশিষ্ট্য

৮.৪ শিখনের ধারণা

৮.৫ প্রজ্ঞামূলক বিকাশ তত্ত্ব

৮.৬ পাঠক্রম রচনা ও প্রজ্ঞামূলক বিকাশ তত্ত্ব

৮.৭ শিখনের সংযোজনবাদ তত্ত্ব (Connectionism)

৮.৭.১ প্যাভলভের অনুবর্তন তত্ত্ব

৮.৭.২ থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুলের তত্ত্ব

৮.৭.৩ স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব

৮.৭.৪ পাঠক্রম ও স্কিনারের তত্ত্ব

৮.৮ শিখনের সমগ্রতাবাদ বা সংগঠনবাদ (Insightful Learning or Constructivism)

৮.৯ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল (Information Processing Model)

৮.১০ উপসংহার

৮.১১ প্রশ্নাবলি

৮.১ সূচনা (Introduction)

শিক্ষা হল সেই প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ব্যক্তি নতুন পরিবেশে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই শিক্ষণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষণ

প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য মানুষের আচরণের কাম্য পরিবর্তন ঘটানো যা তার ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের উন্নয়নে সহায়তা করে। এইজন্য নানারকম পদ্ধতি অনুসরণ করে আমাদের শিক্ষা লাভ হয়। এই পাঠের উদ্দেশ্য হল শিখন সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা গড়ে তোলা। আর শিখনের তত্ত্ব কীভাবে পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তা জানানো। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই অধ্যায়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হল।

৮.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্বের প্রয়োগ ধারা সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল জানতে পারবেন।

৮.৩ শিখনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Learning)

১। শিখন ব্যক্তির ক্ষমতা ও বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল।

২। শিখন এক ধরনের বিকাশ।

৩। প্রফুল্ল চিত্তে শিখনের পর তার স্থায়িত্ব অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৪। ব্যক্তি বৈষম্য শিখনের ফলাফলে প্রতিফলিত হয়।

৫। শিখন উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নতুন সম্বন্ধ স্থায়ী করে।

৬। শিখন অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পরিস্থিতিতে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করতে সাহায্য করে।

৭। শিখন নানাবিধ সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে।

শিখনের তত্ত্ব ও পাঠক্রম ঃ

শিখন হল অভিজ্ঞতালাভের অন্যতম প্রক্রিয়া। শিখনের তত্ত্বগুলি শিখন প্রক্রিয়াকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। এই কারণে শিখনের তত্ত্বগুলি পাঠক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব

বিস্তার করেছে। শিখনের প্রধান তত্ত্বগুলি আলোচনা করলে এই বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। শিখনের তত্ত্বগুলি কোন্ কোন্ বিষয়বস্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যগত দিক থেকে উপযোগী তা বুঝতে সহায়তা করে। সাধারণভাবে শিখনের তত্ত্ব পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করে। এ ছাড়া শিক্ষামূলক উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশকে সহজতর করে।

৮.৪ শিখনের ধারণা (The Concept of Learning)

শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও শিক্ষা কার্যক্রম সাধনে সহযোগিতা করার লক্ষ্য নিয়েই পাঠক্রম শিক্ষণের আবির্ভাব। শিখন হল সেই প্রক্রিয়া যার সহায়তায় ব্যক্তি নতুন পরিবেশে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার দক্ষতা অর্জন করে। শিখনের সময়ে শিক্ষার্থীর আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন তা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের হতে পারে। শিখন দেহে ও মনে পরিবর্তন আনে। শিক্ষার্থীর মানসিক গুণাবলির বিকাশসাধন করে তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শিখনের ফলে ইন্দ্রিয় ও পেশিতে নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। জে. এফ. ট্রেফার (J. F. Trafer, 1972) -এর মতে "শিখন হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণ পরিশোধিত হয়" (learning is the process that results in the modification of behaviour) এম. এল. বিগে (M. L. Bigge, 1979) শিখনকে অন্তর্দৃষ্টি, ব্যবহার, প্রত্যক্ষণ, প্রেষণার পরিবর্তন বা এগুলোর সম্মিলিতভাবে পরিবর্তন (learning may be considered as a change in insights, behaviour, perception, motivation or a combination of these) মনে করেন। শিখন এক ধরনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিকাশ। শিখনের সময় শিক্ষার্থীর সক্রিয় ভূমিকা থাকে। শিখনকে অনেক সময় পরিবেশের প্রভাব বলেও অনেকে মনে করেন। শিখনের লক্ষ্য হল জ্ঞান, দক্ষতা ও ভাবের বিকাশ ঘটানো।

৮.৫ প্রজ্ঞামূলক বিকাশ তত্ত্ব (Cognitive Developmental Theories)

সুইস মনোবিজ্ঞানী জ্যাঁ পিঁয়াজের (Jean piaget) শিশুর জীবনবিকাশ সংক্রান্ত মতবাদ পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিকাশ সংক্রান্ত মতবাদকে দুটি স্ট্র্যাটিজিতে ব্যবহার করা হয়।

১। একটি স্ট্রাটিজি হল শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের স্তর অনুযায়ী পাঠক্রম সাজানো।

২। বৌদ্ধিক বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য যথাযথ শিক্ষা, যাতে বিকাশ দ্রুত ও ত্বরান্বিত হয়।

পিয়াজেঁর মতে শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুনির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত ক্রমশ চিন্তা করার বিকাশ হতে থাকে। প্রত্যেক স্তরের বৈশিষ্ট্য হল কিছু ধারণা বা বৌদ্ধিক সংগঠন আয়ত্ত করা, এগুলিকে schema বলা হয়। জ্ঞানের এই একক বা 'schema' একটি ধারণার মানসিক প্রতিরূপ। পাঠক্রমের মধ্যে নতুন জ্ঞান শিশুর 'schema'-এর পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তনই একদিক থেকে দেখতে গেলে শিখন। নতুন জ্ঞান ক্রমাগত schema-এর পরিবর্তন সাধন করছে।

জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তারা এই অভিজ্ঞতাগুলিকে বর্তমান আচরণ ধারার সাথে আত্মীকরণ করে। আত্মীকরণ (Assimilation) প্রক্রিয়া হল নতুন অভীজ্ঞতাকে অঙ্গীভূত করা। আবার একাজের পুরোনো সংগঠনকে পরিবর্তন করে নিয়ে তাতে নতুন ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে সহযোজন (Accomodation) বা সাঙ্গীকরণ বলে। সহযোজন বা সাঙ্গীকরণ হল একজনের পুরোনো বৌদ্ধিক সংগঠনকে পরিবর্তন করে নিয়ে তাতে নতুন ঘটনা বা অভিজ্ঞতা সুসংবদ্ধ করে নেওয়া। সাঙ্গীকরণের অর্থ এককের মধ্যে এমন অভ্যন্তরীণ অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে নতুন তত্ত্বটি সহজেই অঙ্গীভূত হতে পারে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই পরিবর্তন ঘটে তার অন্যতম হল পৃথকীকরণ (discrimination) ও অভিযোজন (Adaptation). পৃথকীকরণ না হলে কোনো তথ্য কোনো এককের সঙ্গে যুক্ত হবে তা স্থির করা যায় না। অবশ্য পৃথকীকরণের অর্থ এই নয় একবার কোনো তথ্য কোনো একটি এককের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলে আর পরিবর্তন হবে না। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি তথ্য একাধিক এককে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

জীবন বিকাশের প্রতিটি স্তরে শিশুর বুদ্ধিতে একটি সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। পরিবেশের মাধ্যমে শিশু যখন নতুন অভিজ্ঞতাগুলি আত্মীকরণ করে সেগুলি স্কিমার সঙ্গে অভিযোজন করে। অনেক ক্ষেত্রে নিদিষ্ট সময় পর শিশু নতুন অভিজ্ঞতাগুলি আত্মীকরণ করলেও নতুন স্কিমার সঙ্গে সুসংবদ্ধ করতে পারে না, তখন শিশুর মধ্যে মানসিক চাপ ও অসাম্য সৃষ্টি হয়। যখন এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন বৌদ্ধিক গতির সৃষ্টি হয় এবং জীবন বিকাশে নতুন মোড় নেয়।

পিয়াজেঁর অভিমত হল আমাদের সকলের ক্ষেত্রে, পিয়াজেঁ তার প্রজ্ঞামূলক বিকাশের তত্ত্বে উপরোক্ত ধারণাগুলির বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেইসঙ্গে তাঁর মতে জন্ম পরবর্তীকালে চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রজ্ঞামূলক বিকাশ হয়। পিয়াজেঁ এভাবে বৌদ্ধিক বিকাশকে শ্রেণিকরণ করেছেন

যার বৈশিষ্ট্য হল যে প্রত্যেক স্তরে স্কিমার যে রকম বিকাশ হয়, সেই অনুযায়ী শিশু চিন্তন বা বৌদ্ধিক কাজকর্ম করে থাকে। স্তরগুলি হল ঃ

১। সংবেদন ও সঞ্চালনমূলক স্তর (Sensori-Motor-stage)	ঃ	0 থেকে 2 বছর পর্যন্ত
২। প্রাক্ সক্রিয়তা স্তর (Pre-operational stage)	ঃ	2 থেকে 7 বছর বয়স
(a) প্রাক্ ধারণামূলক স্তর (Pre-conceptual thought)	ঃ	2 থেকে 4 বছর বয়স
(b) স্বজ্ঞামূলক চিন্তন স্তর (Intuitive thought)	ঃ	4 থেকে 7 বছর বয়স
৩। সক্রিয় চিন্তন স্তর (Operational stage)	ঃ	7 থেকে 16 বছর
(a) মূর্ত বা বাস্তব চিন্তন স্তর (Concrete Operational stage)	ঃ	7 থেকে 11 বছর
(b) যুক্তি সক্রিয়তার স্তর	ঃ	11 থেকে 16 বছর

পিয়াজেঁ বৌদ্ধিক বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। এগুলো হল ঃ

(১) বুদ্ধির সংজ্ঞা হল প্রাপ্ত তথ্যাবলির মাধ্যমে শিশুর আচরণে রূপান্তর ঘটানো। এই প্রক্রিয়া বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়। এগুলিকে বলা হয় তথ্য প্রক্রিয়াকরণের যৌক্তিক কাঠামো বা স্কিমা।

(২) বিকাশ শুরু হলে এক স্তরের সক্রিয়তা থেকে অন্যস্তরের সক্রিয়তার সূচনা ঘটে।

(৩) বিকাশের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও পরিমনণের কার্যকরী সমন্বয় ঘটে।

৮.৬ পাঠক্রম রচনা ও প্রজ্ঞামূলক বিকাশতত্ত্ব

প্রথমত পাঠক্রমে কোন কোন বিষয়বস্তুগুলি শিশু তার প্রজ্ঞামূলক বিকাশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আত্মীকরণ করতে পারবে তা প্রথমে নির্বাচন করা হয়। প্রাক্প্রাথমিক স্তরে তাই শিশুদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষণ ক্ষমতার উন্নয়ন ও পরিশীলিত করার উদ্দেশ্যে চিত্র, অঙ্গসঞ্চালনমূলক খেলা, সংগীত, নৃত্য, গান ইত্যাদি বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচিত করার ওপর শিক্ষাবিদ্রা জোর দেন।

দ্বিতীয় স্তরে শিশুদের মূর্ত বস্তু থেকে ক্রমশ বিমূর্ত চিহ্ন সংকেত ইত্যাদির ব্যবহার ও প্রস্তুতির দিকে জোর দিতে হবে।

তৃতীয় স্তরে মূর্ত বস্তু থেকে বিমূর্ত চিন্তায় উত্তরণ সম্ভব হলে পাঠক্রমে যুক্তি নির্ভর বিষয়বস্তু যেমন পাটিগণিত থেকে বীজগণিত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

চতুর্থত বা সর্বশেষ স্তরে বিশুদ্ধ যুক্তি নির্ভর বিষয়বস্তুর সংযোজন পাঠক্রমে হওয়া উচিত যাতে করে শিশুর বিমূর্ত চিন্তন, নিজস্ব প্রবণতার উন্নয়ন ও উৎকর্ষ বিকাশে সহায়তা ঘটানো সম্ভব হয়।

অবশ্য পিয়াজেঁর তত্ত্ব সার্বজনীন স্বীকৃত হয়নি। মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে দেখেছেন যে, এই বিন্যাসের স্তরগুলি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁদের মতে প্রজ্ঞামূলক বিকাশের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতার কার্যকরী সমন্বয়ের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

৮.৭ শিখনের সংযোজনবাদ তত্ত্ব (Connectionism Theories of Learning)

শিখনের তত্ত্ব প্রথমদিকে ছিল আচরণবাদী মত নির্ভর। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর যে আচরণ বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায় সেই আচরণে বাঞ্ছিত কোনো পরিবর্তনকেই বলা হয় শিখন। এই পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যে উদ্দীপক উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করা হয়, তার সঙ্গে প্রত্যাশিত আচরণের সংযোগকেই বলা হয় শিখন।

প্যাভলভের অনুর্বতন তত্ত্ব, থর্নডাইকের মতবাদও স্কিনারের মতবাদকে বলা হয়। অর্থাৎ সংযোজনবাদীদের তত্ত্বের মূলভিত্তি নীচে উপস্থাপিত করা হল ঃ

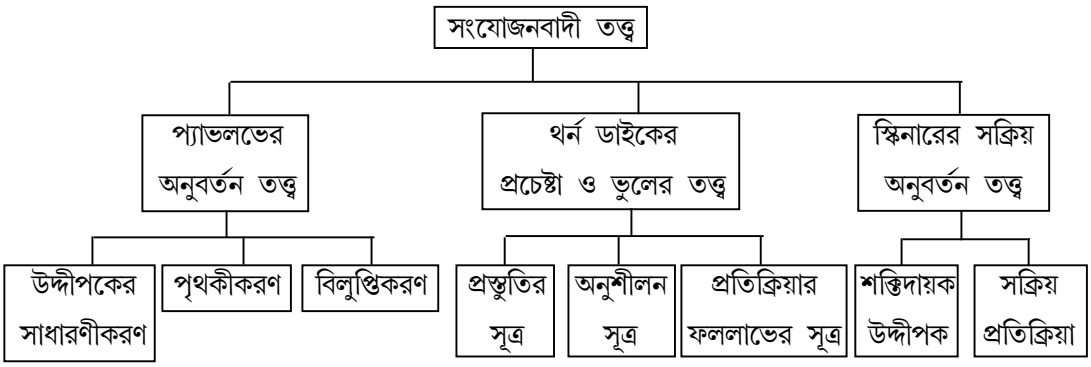

ছক : ৮(১) সংযোজনবাদীদের মতবাদের ভিত্তি শিখনের মূলস্তর উপস্থাপিত করা হল।

৮.৭.১ প্যাভলভের অনুবর্তন তত্ত্ব (Condition Reflex Theory of Learning)

প্যাভলভের মতে সবরকম শিখনের মূল সূত্র হল সাপেক্ষীকরণ বা অনাপেক্ষীকরণ (conditioning and deconditioning). এই মতামত অনুসারে সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ উদ্দীপক যদি

বার বার একইসঙ্গে উপস্থিত করা হয় তাহলে কেবলমাত্র সাপেক্ষ উদ্দীপক বা কৃত্রিম উদ্দীপকটি উপস্থাপিত করেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা যেতে পারে। একটি কুকুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে প্যাভলভ দেখেছিলেন যে কুকুরকে খাদ্য দেবার আগে যদি নিয়মিতভাবে ঘন্টা বাজানো হয়, তাহলে ঘন্টা বাজানোর শব্দ শুনেই কুকুরের মুখে লালা বের হয়ে যাবে। প্যাভলভের মতে তিনটি বিশেষ ধারণা অনুবর্তনজাত শিখনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যেমন—

উদ্দীপকের সাধারণীকরণ (Stimulus generalization)—যখন কোনো প্রাণী একটি উদ্দীপকের পর স্বাভাবিকভাবে অন্য একটি উদ্দীপক প্রত্যাশা করে এবং সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করে, তখন তাকে বলা হয় উদ্দীপকের সাধারণীকরণ। যেমন—কুকুরটি ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে খাদ্য প্রত্যাশা করায় লালা নিঃসরণ করে। এখানে ঘণ্টাধ্বনি নামক উদ্দীপকের সাধারণীকরণ হল।

পৃথকীকরণ (Discrimination) ঃ সাধারণীকরণের পূর্বে প্রয়োজন হয় ফলদায়ক উদ্দীপকের সঙ্গে অন্য উদ্দীপকের পার্থক্য নির্ণয় করা বা উপস্থিত অন্য উদ্দীপক থেকে ফলদায়ক উদ্দীপককে পৃথকীকরণ।

বিলুপ্তিকরণ (Exlinction) ঃ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক উদ্দীপকের বিলুপ্তি ঘটিয়ে স্থায়ীভাবে অনুবর্তিত উদ্দীপকের সঙ্গে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সংযোগসাধনই অনুবর্তন।

পাঠক্রমের ওপর এই তত্ত্বের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে। তবে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর পারস্পরিক বা সাংগঠনিক দিক থেকে শিক্ষার্থীর কাছে অভিজ্ঞতাগুলি কীভাবে স্থায়িত্ব লাভ করবে এবং কীভাবে মধ্যবর্তী অভিজ্ঞতার অবলুপ্তি ঘটিয়ে চূড়ান্ত শিখন সম্পন্ন হবে তার আভাস পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৮.৭.২ থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুলের তত্ত্ব (Thorndike's Theory of Trial and Error)

এই তত্ত্বের মূলকথা হল শিখন একটি উদ্দীপকের সঙ্গে, নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার সংযোগসাধন। বারবার ভুল আচরণ করতে করতে শেষে প্রত্যাশিত আচরণ সম্পন্ন হয়। আর উদ্দিষ্ট সংযোগ তখন ধীরে ধীরে স্থায়ী হয়। তাঁর মতে এই সংযোগ স্থায়ী হওয়ার সূত্র হচ্ছে,

(১) প্রথম সূত্রটি হল প্রস্তুতি সূত্র (Law of readiness)

উদ্দীপক ও তার উপযোগী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। শেখার জন্য শিক্ষার্থীর মনে প্রস্তুতি থাকলে প্রতিক্রিয়া

আনন্দদায়ক হয়। আর মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে কাজটি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর মনে হবে। পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই সূত্র বিশেষ ভূমিকা নেয়। পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়টি শিক্ষার্থীর পূর্বোক্ত ধারণা বা প্রস্তুতির ভিত্তিতে স্থির করা উচিত।

(২) দ্বিতীয় সূত্রটি হল অনুশীলনের সূত্র (Law of exercise)

ফলদায়ক প্রতিক্রিয়া বারবার করতে করতে ক্রমশ উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক স্থায়ী বা সুদৃঢ় হয়। আবার প্রতিক্রিয়া করায় দীর্ঘকাল বিরত থাকলে সংযোগ শিথিল হয়ে যায়। এই সূত্রটির মূল বক্তব্য হল অনুশীলন (exercise practice) উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করে। শিক্ষার্থীর শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই সূত্রটির বিশেষ প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি। কবিতা মুখস্থ করা, ভাষা শেখা, গান শেখা, গাড়ি চালানো, টাইপ করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনুশীলন কাজটি নিয়মিত করলে যথাযথভাবে কাজ করতে সহায়তা করে। এই সূত্রকে ভিত্তি করে পাঠক্রমে 'পাঠ' শেষে অনুশীলন সংযুক্তি হয়। গণিত ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনুশীলনের সুযোগ আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৩) ফললাভের সূত্র (Law of effect) ঃ

একই অবস্থায় একটি কাজ বারবার করার ফলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগ স্থাপিত হয়, সেই সংযোগটি শিক্ষার্থীর কাছে সন্তোষজনক হয় তবে উক্ত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত উদ্দীপকের সংযোগ স্থায়ী হয়। এই সূত্রকে অনেক সময় পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কিত নিয়ম (Law of reward and punishment) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

থর্নডাইকের সবচেয়ে বড়ো অবদান তার ফললাভের সূত্র। পাঠক্রমের ওপর এর কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পাঠক্রমে বিষয়বস্তু সাজানোর সময় এমনভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয় যে শিক্ষার্থী পূর্ববর্তী শিখনের সঙ্গে পরবর্তী শিখনের সংযোগসাধন করে এক ধরনের সন্তুষ্টি লাভ করে।

৮.৭.৩ স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব (Skinner's Operent Conditionning)

স্কিনার বিশ্বাস করতেন বেশিরভাগ প্রতিক্রিয়া কিছুতেই কোনো জ্ঞাত উদ্দীপক দ্বারা জাগ্রত হতে পারে না। স্কিনার উদ্দীপক না থাকলে প্রতিক্রিয়াও অনুপস্থিত এই তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রাধান্য দেন স্বতঃক্রিয়ামূলক আচরণের দিকে যা কোনো উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্টি নয়। এটি প্রতিক্রিয়াজাত

অনুবর্তন নামে পরিচিত। তিনি মনে করেন শিক্ষার্থীর উত্তরকে শিক্ষক যদি অনুমোদন করেন তবে এই উত্তরটি স্থায়ীভাবে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। সুতরাং শিক্ষকের অনুমোদনসূচক বাক্য বা ইঙ্গিত শক্তিদায়ক উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার এই সম্পর্ক স্থাপনে শক্তিদায়ক উদ্দীপকের ভূমিকা এবং তারই ভিত্তিতে ধারাবাহিক আচরণের পরিবর্তন সাধন, স্কিনারের তত্ত্বের সবচেয়ে বড় অবদান।

৮.৭.৪ পাঠক্রম ও স্কিনারের তত্ত্ব

স্কিনারের তত্ত্ব পাঠক্রমে শিক্ষণ পদ্ধতির এক বিশেষ দিক উন্মোচিত করে। তারই তত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরি হয় সূচিবদ্ধ শিক্ষণ (programmed instruction) পদ্ধতি। এই পদ্ধতি বিশেষ মৌলিক নীতির ভিত্তিতে প্রস্তুত। এগুলি হল ঃ

(১) একবার একটি ধাপ (principle of small step)—পাঠক্রমে বিষয়বস্তুকে কতকগুলো অর্থবহ খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। শিক্ষার্থীর একটি ধারণা সম্পূর্ণ শেখা হলে তবেই পরবর্তী ধারণা শেখায় অগ্রসর হবে। বিজ্ঞান, গণিত, ব্যাকরণ ইত্যাদি শেখার সময় পাঠক্রমে বিষয়কে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে ক্রমান্বয়ে সাজানো হয়।

(২) নিজ গতিতে শেখা (Self pacing in learning)—শিক্ষার্থী তার নিজের ক্ষমতানুযায়ী যতটা শেখা যায় ততটাই শিখবে।

(৩) সক্রিয় প্রত্যুত্তর দান (Active responding)—শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে প্রতিটি পর্যায়ে প্রত্যুত্তর দেবে।

(৪) তাৎক্ষণিক প্রতি সংকেত (Immediate feed back)—প্রতিটি প্রতিক্রিয়ার ভালোমন্দ, শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা তাৎক্ষণিক জানিয়ে দেবে।

৮.৮ শিখনের সমগ্রতাবাদ বা সংগঠনবাদ (Insightful Learning or Constructivism)

শিখনের প্রজ্ঞামূলক সংগঠন তথা সমগ্রতাবাদের ওপর গেস্টাল্টবাদীরা বিশেষ জোর দিয়েছেন। গেস্টাল্ট বা সমগ্রবাদীদের মতে আমরা যখন কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ করি, তখন বিষয়টিকে ছোটো ছোটো অংশে প্রত্যক্ষ না করে সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করে থাকি।

গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিক্ষণ প্রক্রিয়া হল অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কোনো বিশেষ সমস্যার পূর্ণ স্বরূপ বুঝে নিয়ে কীভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে তা জেনে নেওয়া এবং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কোনো সমস্যার বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে পূর্ণ সমস্যাটির সম্বন্ধ সমগ্রভাবে উপলব্ধি করা। তাই শিক্ষণ হল সমগ্র ও অংশের পারস্পরিক সংযোগ অবধারণ করা, অবশ্য এই অবধারণ শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই সংগঠিত হয়ে থাকে। কাজেই শিক্ষণ প্রক্রিয়া কোনো অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, এ হল সমগ্র পরিস্থিতি বা সমস্যা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি। গেস্টাল্ট তত্ত্বের অন্তর্দৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে আকস্মিক একটি সাংগঠনিক পরিবর্তন যা একটি নতুন ধারণার জন্ম দেয়।

সাংগঠনিক পরিবর্তনের কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত তারা বলেছেন। এগুলি হল—

(১) সাদৃশ্য (similarity)—অর্থাৎ সদৃশ অভিজ্ঞতাগুলি সহজেই সংগঠিত হয়ে একটি এককে পরিণত হয়।

(২) নৈকট্য (proximity)—কাছাকাছি অভিজ্ঞতাগুলি সহজেই একটি এককে পরিণত হয়।

(৩) পরিচিতি (familiarity)—চেনা বা জ্ঞান বিষয়ে সংগঠন সহজে হয়।

(৪) সংযুক্তি (contiginity)—যদি অভিজ্ঞতাগুলি কোনোভাবে সংযুক্ত হয় তাহলে এই ধারাবাহিকতা সহজেই অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করে।

এই শর্ত বা নীতিগুলি এবং গেস্টাল্ট তত্ত্বের মূলকথা সামগ্রিক (wholeness) ও সংগঠন একত্রিত করলে পাঠক্রমের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। এগুলি হল—

প্রথমতঃ পাঠক্রমে বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত যাতে করে চেনা থেকে ক্রমশ অজানা বা অপরিচিত বিষয়ের দিকে শিক্ষার্থী অগ্রসর হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ সদৃশ বা একগোত্রীয় বিষয়বস্তু একই জায়গায় সংগঠিত হয়।

তৃতীয়তঃ পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা যেন সরল সংগঠন থেকে জটিল সংগঠনের দিকে প্রসারিত করা যায়।

চতুর্থতঃ বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে।

পঞ্চমতঃ কোনো একটি বিষয়ের জ্ঞান হবে অন্তত সেই স্তরের জন্য সম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ বিষয়ের সংগঠন, শিখনের অন্তরায়।

আসলে সংগঠনবাদ মূলত পাঠক্রমের পাঠ্যবিষয়ের অর্থ উপলব্ধি সংগঠন ও সংহতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টি অর্থাৎ তার সহজাত প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে জোর দেওয়া। আর এইজন্য অনুকূল শিক্ষণ পরিমণ্ডল তৈরি করা যাতে তার প্রত্যাশিত আচরণকে সহায়তা করা, পরিচালিত করা, উৎসাহিত করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ পাঠক্রমের বিষয়বস্তু, অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতি শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি, বিচারবুদ্ধি ও চিন্তার ক্ষমতাকে উন্নত করতে চায় ও তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে।

৮.৯ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল (Information Processing Model)

শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষণ মডেলের অন্য একটি উৎস হল শিক্ষার্থীর তথ্য প্রক্রিয়াকরণের সামর্থ্য। এই মডেল শিক্ষার্থী কীভাবে উদ্দীপকসমূহকে নাড়াচাড়া করে, তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্য সংগঠন করে তথ্যবিন্যাস করে, সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়ার চেষ্টা করে, তথ্যাবলি বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করার ক্ষমতা ইত্যাদির ওপর জোর দেয়। এই প্রক্রিয়াকরণ মডেল অনুযায়ী পাঠক্রমে বৌদ্ধিক ক্ষমতা ও সৃজনীশক্তি বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ডেভিড আসুবেল, ব্রুনার, রিচার্ড সার্চম্যান প্রমুখ শিক্ষাবিদরা হলেন এই মডেলের প্রবক্তা, ব্রুনার ধারণা গঠন (concept attainment model)-এ মূলত আরোহীমূলক (inductive) চিন্তন ও ধারণা সংক্রান্ত বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং পঠনপাঠনের মাধ্যমে যুক্তি শক্তিবিকাশে গুরুত্ব দেন। আবার জোসেফ জে এজলুকাস বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে অনুসন্ধান ও স্মরণমূলক বিকাশে গুরত্ব দেন।

ব্রুনার তার মডেল অনুযায়ী পাঠক্রম রচনার সময় চারটি ব্যাপারে জোর দিতে বলেছেন।

(১) বৈপরীত্যে জোর দেওয়া (emphasing contrast) ঃ যেমন রাত ও দিন, সাদা ও কালো, বর্তমান ও অতীত, শিশু ও পরিণত মানুষ ইত্যাদি বৈপরীত্য।

(২) তথ্য অনুমান করায় উৎসাহ দান (stimulating information guessing) ঃ পাঠক্রমে বা শিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রথমে শিশুদের নিজের ধারণা ব্যক্ত করায় উৎসাহ দিতে হবে। পরে প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করা।

(৩) তথ্য সংগ্রহে সক্রিয় অংশগ্রহণ (encouraging participation) ঃ হাতেকলমে প্রকৃতি বা অন্য জায়গা থেকে শিক্ষার্থী অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহকরণে জোর দেওয়া।

(৪) সচেতনতা জাগ্রত করা (Awarness building) ঃ শিক্ষার্থীর নিজ পরিবেশ ও নানা সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করার সুযোগ ও শিক্ষণ পরিমণ্ডল প্রস্তুতিতে জোর দিতে হবে।

৮.১০ উপসংহার (Conclusion)

এই পাঠে শিক্ষণ ও পাঠক্রম সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এইসব তত্ত্বগুলির সঙ্গে পাঠক্রমের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে এইসব তত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। সংযোগবাদীরা যেখানে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপনে গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি আবার সমগ্রবাদীরা পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে অর্থ উপলব্ধি সংগঠন ও সংহতির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন ও সঙ্গে শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টি বিকাশে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিখনের প্রজ্ঞামূলক বিকাশতত্ত্বে শিক্ষার্থীর বিকাশের স্তর অনুযায়ী পাঠক্রম সাজানো ও বিকাশকে দ্রুত ত্বরান্বিত করার জন্য বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতার সংযুক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল আবার পাঠক্রমের সাহায্যে শিশুর বৌদ্ধিক ক্ষমতা, কৌতুহল স্পৃহা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও মানসিক চিন্তন ক্ষমতা বিকাশে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছে। পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে এইসব তত্ত্বগুলি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করলেও এইসব মতবাদ কোনোটিই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। উপযুক্ত পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে এদের কার্যকরী সমন্বয় প্রয়োজন।

৮.১১ প্রশ্নাবলি (Questions)

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay type Questions)

১। শিখন বলতে কী বোঝায়? পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে শিখনের তত্ত্বগুলির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

২। শিখনের সমগ্রবাদ তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? পাঠক্রম রচনায় এই তত্ত্বের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করুন।

৩। শিখনের সংযোগবাদ তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? পাঠক্রম প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব কী কী নীতির ওপর জোর দিয়েছে তা উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৪। থর্নডাইকের শিখন সম্বন্ধে প্রচেষ্টা ও ভুল তত্ত্বের আলোচনা করুন। পাঠক্রম প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।

৫। প্রজ্ঞামূলক বিকাশতত্ত্ব কী? পাঠক্রম প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব কীভাবে ব্যবহার হবে তা আলোচনা করুন।

৬। স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? পাঠক্রমের উপাদান নির্বাচন ও বিন্যাসে এই তত্ত্ব কীভাবে ব্যবহার করা যাবে?

৭। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

(ক) শিখনের সংযোগবাদতত্ত্ব।

(খ) প্রজ্ঞামূলক বিকাশতত্ত্ব।

(গ) পাঠক্রম ও সমগ্রতাবাদ।

(ঘ) শিখনের সমগ্রতাবাদ।

(ঙ) শিখনের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল।

(চ) শিখনের তত্ত্ব ও পাঠক্রম।

একক ৯ ❑ পাঠক্রম রচনা (Curriculum Construction)

গঠন

৯.১ সূচনা

৯.২ উদ্দেশ্য

৯.৩ পাঠক্রম রচনার নীতি সমূহ

৯.৩.১ পাঠক্রমে উপাদান নির্বাচন নীতি

৯.৩.২ পাঠক্রমে উপাদান বিন্যাস নীতি

৯.৩.৩ পাঠক্রমে ক্রিয়াগত নীতি

৯.৪ পাঠক্রমে শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণিবিন্যাস

৯.৪.১ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা

৯.৪.২ শিক্ষার লক্ষ্য ও তার শ্রেণিবিভাগ

৯.৪.৩ জ্ঞানবর্গের লক্ষ্য সমূহ

৯.৪.৪ প্রাক্ষোভিক বা অনুভবমূলক লক্ষ্য

৯.৪.৫ সঞ্চালন বর্গের লক্ষ্য

৯.৫ পাঠক্রম রচনা এবং সিস্টেম পদ্ধতি

৯.৫.১ সিস্টেম পদ্ধতির ধারণাগত ভিত্তি

৯.৫.২ সিস্টেম পদ্ধতির পাঠক্রম রচনার পর্যায়ক্রম

৯.৬ উপসংহার

৯.৭ প্রশ্নাবলি

৯.১ সূচনা (Introduction)

পাঠক্রম শিক্ষার একটি অত্যন্ত গুরুত্ব উপাদান। পাঠক্রমের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করছে শিক্ষা কর্মসূচির সফলতা। তাই সমাজের প্রয়োজন ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের ভিত্তিতে প্রভাবিত হয়েছে পাঠক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এইসব মতবাদের প্রেক্ষিতে নির্বাচিত হয়েছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষণ পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি। তার ফলশ্রুতি হিসেবে এসেছে বিষয়ভিত্তিক, জীবনভিত্তিক, কর্মভিত্তিক, অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম ইত্যাদির চিন্তাধারা। এ ছাড়া পাঠক্রম রচনায় প্রভাব ফেলেছে শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব। পাঠক্রমের লক্ষ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টি ও শিখনের নানা তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রস্তুত হয়েছে পাঠক্রম রচনার নীতি সমূহ-উপাদান নির্বাচনের নীতি, পাঠক্রমের উপাদান বিন্যাসের নীতি, পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও তার শ্রেণিবিন্যাস নীতি ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে এইসব ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

৯.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে, শিক্ষার্থীরা—

- পাঠক্রম রচনার নীতি নির্ধারণ করতে পারবেন।
- পাঠক্রমে শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণিবিন্যাস সম্বন্ধে সম্যক ধারণা উপলব্ধ করতে পারবেন।
- পাঠক্রম রচনা ও সিস্টেম পদ্ধতির সঠিক বর্ণনা দিতে পারবেন।

৯.৩ পাঠক্রম রচনার নীতি সমূহ (Principles of Curriculum Construction)

আধুনিককালে, শিক্ষা বিজ্ঞানে পাঠক্রম রচনা ও তার বাস্তব রূপায়ণের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাঠক্রম রচনার ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা দেখেছি পাঠক্রমের বিষয়বস্তু কখনও গুরুত্ব পেয়েছে জ্ঞান বৃদ্ধির ওপর আবার কখনও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীর জীবনের অভিজ্ঞতা, আবেগ ও সমাজজীবনের অভিযোজনের ওপর। বিভিন্ন শিক্ষা দার্শনিক তাদের মতামতের পার্থক্য সত্ত্বেও পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেন। এগুলি হল—

(১) পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচনের নীতি

(২) পাঠক্রমে বিষয় বিন্যাসের নীতি

অবশ্য পাঠক্রম রচনার সময় তার বাস্তব উপযোগিতা ও সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। আধুনিককালে তাই পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদরা ক্রিয়াগত নীতি (Operational principle)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। এই তিন নীতির পারস্পরিক সম্পর্ক নীচে ছকাকারে দেখানো হল।

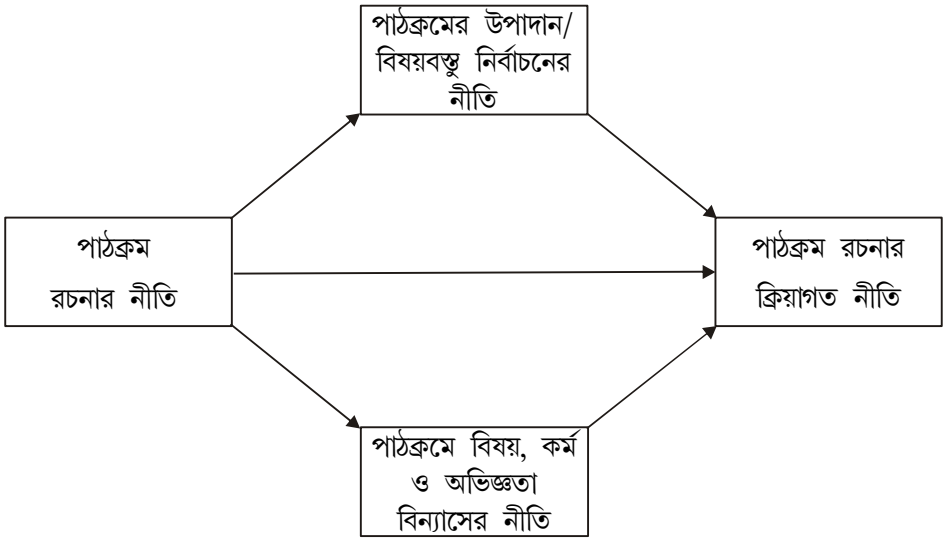

চিত্র ৯.১ ঃ পাঠক্রম রচনার নীতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক

৯.৩.১. পাঠক্রমে উপাদান নির্বাচন নীতি ঃ (Principle for Selection of Contents in Curriculum)

শিক্ষাবিদরা বিভিন্ন সময়ে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কয়েকটি নীতির উল্লেখ করেছেন। তাদের নিম্নলিখিত নীতিগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) উদ্দেশ্য কেন্দ্রিকতার নীতি (Principles of objective centredness) ঃ এই নীতিটি শিক্ষার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই নীতি অনুযায়ী পাঠক্রমের উপাদান—বিষয়, কর্ম ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার মূল লক্ষ্যের সহায়ক হতে হবে। তাই বিষয় নির্বাচন করার সময় মূল লক্ষ্য বিশ্লেষণ প্রথমে প্রয়োজন। তারই ভিত্তিতে পরে বিষয় নির্বাচন করা দরকার। যেমন শিক্ষার লক্ষ্য যদি হয় ব্যক্তিগত উৎকর্ষসাধন তাহলে পাঠক্রমে শারীরচর্চা, বৌদ্ধিক বিকাশ, অনুসন্ধিৎসা, প্রবণতা, স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষা অন্তর্দৃষ্টি বিকাশ ও দক্ষতা অর্জনে জোর দেওয়া প্রয়োজন। এই নীতি অনুসরণ করলে সমগ্র পাঠক্রমটি শিক্ষার উদ্দেশ্যমুখী হবে এবং পাঠক্রমটি তার উদ্দেশ্য সফলে সক্ষম হবে।

(২) শিশু কেন্দ্রিকতার নীতি (Principles of child centredness) ঃ আধুনিককালে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটানো। তাই শিশুর প্রজ্ঞা বিকাশের স্তর, আগ্রহ, প্রবণতা, প্রেষণা, চাহিদা ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠক্রমে বিষয় ও পাঠ প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

(৩) সমাজ কেন্দ্রিকতার নীতি (Principle of community centredness) ঃ শিক্ষার মূল লক্ষ্য ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্তন ঘটানো এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা। তাই আধুনিককালে পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচনের সময় একদিকে যেমন ব্যক্তির উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে অন্যদিকে এই বিষয়বস্তু সংযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থী যাতে সমাজে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। সমাজের প্রয়োজন হল পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষা, অভিযোজন, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা, উৎপাদন ও উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষার্থীকে উদ্যোগী করা, তাই উপযুক্ত বিষয় নির্বাচন করে শিশুর চাহিদা ও সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে হবে।

(৪) সংরক্ষণের নীতি (Principles of conservation) ঃ শিক্ষার মাধ্যমে অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ এবং তার সঞ্চালন পাঠক্রমের অন্যতম বিশেষ লক্ষ্য। এর জন্য পাঠক্রমে মানবজাতির পূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। এর মূলকথা হল জাতীয় কৃষ্টির সব অভিজ্ঞতাগুলিকে উপযুক্ত বিষয়ের মাধ্যমে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তি করা প্রয়োজন।

(৫) অগ্রমুখিতার নীতি (Principles of forwardness) ঃ এই নীতি অনুযায়ী বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষার্থীকে সচেতন, দক্ষ ও উপযোগী করার দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, আর্থসামাজিক পরিবর্তন, বিশ্বায়নের গতিমুখ তথ্য ও প্রযুক্তি ইত্যাদির কথা মনে রেখে পাঠক্রমে প্রয়োজনমাফিক এসব বিষয় ও উন্নয়নের নীতি সম্পর্কিত বিষয়বস্তু সংযুক্তিতে নজর দেওয়া হয়।

(৬) সৃজনশীলতার নীতি (Principles of creativeness) ঃ শিক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীলতার পরিপোষণ ও বিকাশ ঘটানো শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই পাঠক্রমে বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচিত হবে যে তার সৃজনীপ্রতিভা ও অনুসন্ধিৎসা বিকাশে সহায়ক হয়। তাই শিল্প ও সাহিত্যচর্চা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা ইত্যাদি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

(৭) **বৃত্তিমুখি নীতি (Principles of job orientation) ঃ** পাঠক্রমের সাহায্যে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজন যাতে মেটে সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। তাই শিক্ষার্থীর চাহিদা, ক্ষমতা, জীবিকার সুযোগ ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বৃত্তিগুলি নির্ধারণ করা উচিত। পরে এইসব বৃত্তির সহায়ক উপযুক্ত বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

৯.৩.২ পাঠক্রমে উপাদান বিন্যাস নীতি (Principles Organisation of Elements in Curriculum)

পাঠক্রমে বিষয়বস্তু বিচ্ছিন্নভাবে না রেখে সুনির্দিষ্ট বিন্যাস প্রয়োজন। এ ব্যাপারে শিক্ষাবিদরা দুটি নীতির কথা বলেছেন। এগুলি হল—

(১) **সম্বন্ধের নীতি (Principles of integration) ঃ** পাঠক্রম রচনার সময় দুই ধরনের সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। এগুলি যেমন—প্রথমত, পাঠক্রমে শিশুর বৈশিষ্ট্য, সামাজিক চাহিদা, জীবনমুখী অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানো, অন্যটি নির্বাচিত বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা সংহতি (correlation) বজায় রাখা। যেমন—জীবনবিজ্ঞানের (life science) ক্ষেত্রে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও শারীরবিদ্যার বিষয়কে একত্রিত করে একটি সমন্বয়িত বিষয়ে পরিণত করা হয়। পাঠক্রমের এই নীতিকে principles of integration বলা হয়। এই নীতি অনুযায়ী পাঠক্রমে একটি সংগতি আসে ও শিক্ষার্থী একটি সামগ্রিক ধারণা নিতে সক্ষম হয়। কেন্দ্রীয় পাঠক্রমে (Core curriculum) এই নীতি অনুসৃত হয়।

(২) **ক্রমবিন্যাসের নীতি (Princciples of item/Content arrangement) ঃ** শিক্ষণ তত্ত্বগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা এই নীতি দেখতে পাই। পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তি হওয়া প্রয়োজন। এই ব্যাপারে শিখনের প্রজ্ঞামূলক বিকাশের নীতিকে সামনে রেখে বিষয়বস্তুর বিন্যাস হলে ভালো। তা ছাড়া বিষয়বস্তু চেনা থেকে অচেনা জ্ঞান আহরণে, সহজ থেকে জটিল বিষয়ের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে স্কিনার ও থর্নডাইকের শিক্ষণ তত্ত্বের ভিত্তিতে বিষয় অন্তর্ভুক্তি হলে ভালো। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর পরিণমনের মান ভিত্তিতে বিষয়বস্তুর অর্থবহ উপলব্ধির সংগঠন ও সংগতির ওপর জোর দিয়ে বিষয়বস্তুর কাঠিন্য (difficulty level) নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। এইভাবে বিষয়বস্তু পাঠক্রমে বিন্যাস হলে শিশুর কাছে এর উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।

৯.৩.৩ পাঠক্রমে ক্রিয়াগত নীতি (Operational Principles of Curriculum)

কোনো পাঠক্রমের সাফল্য নির্ভর করে ব্যাবহারিক উপযোগিতা ও প্রায়োগিক কৌশলের ওপর। এই ব্যাপারে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, এন.সি.আর.টি. ও বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন নানারকম নীতির কথা বলেছেন। এই নীতিগুলি নিম্নলিখিত প্রকার ঃ—

(ক) **সক্রিয়তার নীতি** (Principles of dynamism) ঃ এই নীতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়, মন, বৃদ্ধি, বুদ্ধি, দেহ ইত্যাদির সক্রিয়তার জন্য পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচনে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে পাঠক্রমের বাস্তব ও জীবনমুখী বিষয় ও অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষার্থীর উপরোক্ত সামগ্রিক সক্রিয়তার ও পরিপূর্ণতার উদ্দেশ্যে বিষয় অন্তর্ভুক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

(খ) **নমনীয়তার নীতি** (Principles of variability or flexibility) ঃ একবার পাঠক্রম প্রস্তুত হয়ে গেলে চিরকালের জন্য চলতে পারে না। শিক্ষার্থীর চাহিদা, সামাজিক চাহিদা, মানবসম্পদ উন্নয়ন নীতি ইত্যাদির সঙ্গে ভারসাম্য পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস, সংযোজন ও পরিমার্জন হওয়া প্রয়োজন। নমনীয়তার মাধ্যমে পাঠক্রমে বৈচিত্র্যতা আনা যায়। নমনীয়তার আরেকটি শর্ত হল, পাঠক্রমের মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ উদ্যোগে প্রতিনিয়ত পঠনপাঠনে নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যোগ করা।

পাঠক্রম রচনা করা একার কাজ নয়। একাজে শিক্ষক, পরিচালক, পুস্তক প্রস্তুতকারক, নীতি নির্ধারক প্রমুখ ব্যক্তিদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। পাঠক্রম প্রস্তুত করার সময় শিক্ষার্থীর মানসিক দিকের সঙ্গে পরিস্থিতির ভারসাম্য রেখে পাঠক্রম প্রস্তুত করা প্রয়োজন। অর্থাৎ পাঠক্রমে জীবনভিত্তিক ও পরিবেশভিত্তিক বিষয় ও অভিজ্ঞতার সঠিক মেলবন্ধন ঘটানো দরকার।

৯.৪ পাঠক্রমে শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণিবিন্যাস (Taxonomics of Educational Objectives of Curriculum)

৯.৪.১ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা (Concept of Educational Objectives)

শিক্ষা একটি বৃহৎ ও সামগ্রিক ধারণা। শিক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন পাঠক্রমে তার প্রতিফলন ঘটা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু একজন শিক্ষক যখন দৈনন্দিন পঠনপাঠনের পরিকল্পনা রচনা করেন বা পরিচালনা করেন তার পক্ষে তখন শিক্ষার বৃহত্তর বা সঠিক উদ্দেশ্য অর্জন করার বিষয়টি

প্রায় অসম্ভব প্রয়াস ছাড়া কিছু নয়। কারণ সার্বিক উদ্দেশ্য একটি জীবনব্যাপী প্রয়াস। স্কুলের প্রতিদিনের পঠনপাঠনে, একটি মাস, একটি বৎসর বা সমগ্র বিদ্যালয় জীবনেও এই অন্তিম উদ্দেশ্যের কয়েকটি পদক্ষেপ মাত্র শিক্ষার্থী নিতে পারে। তাই চরম/অন্তিম উদ্দেশ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাকে কোন সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করে না। **তাই শিক্ষণ ও নিবিড় শিক্ষণ শিক্ষার অঙ্গমাত্র।**

শিক্ষকের সামনে বড় প্রশ্ন কী পড়াবেন, কেন পড়াবেন, পাঠক্রমের কোনো একটি বিষয় কীভাবে পড়াবেন, কীভাবে তিনি জানতে পারবেন যে শিক্ষার্থী কতটা শিখতে পেরেছে। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য শিক্ষককে কিছু তাৎক্ষণিক লক্ষ্য স্থির করে নিতে হয় যা তাকে পঠনপাঠনের পরিচালনার ক্ষেত্রে পথ দেখাবে। সহজ কথা এই হল, শিক্ষার লক্ষ্য (Educational Objectives)। শিক্ষার লক্ষ্যের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে—

শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জনের পথে কোনো একটি বিশেষ ক্ষুদ্রতর পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ শেষে কী আচরণ করতে পারবে সে সম্বন্ধে অর্থাৎ তাদের সম্ভাব্য আচরণ পরিবর্তন সম্বন্ধে একটি প্রান্তিক আগাম ধারণা। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য (Educational Objectives) হচ্ছে শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জনের ধাপ বা পদক্ষেপ। আমরা জানি সাধারণভাবে পাঠক্রম বা শিক্ষক পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থীকে পরপর বিভিন্ন বিষয় ও অভিজ্ঞতা উপস্থাপনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। তাই পাঠক্রম প্রস্তুতির সময় বা শিক্ষক তার পঠনপাঠন কার্য পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীর মধ্যে কী আচরণ বা পরিবর্তন আশা করেন সে সম্বন্ধে অগ্রিম ধারণা থাকা প্রয়োজন। আর পাঠক্রম ও শিক্ষণের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণে যে পরিবর্তন ঘটবে বা যে প্রগতি ঘটবে সেই প্রত্যাশিত অন্তিম ফলই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

শিখনের ওপর শিক্ষার্থীর আচরণে প্রত্যাশিত যে পরিবর্তন ঘটবে বা আচরণের যে প্রগতি ঘটবে সেই প্রত্যাশিত আচরণের পরিবর্তন তিনপ্রকার হতে পারে—মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও দৈহিক প্রতিক্রিয়া বা সঞ্চালনমূলক।

৯.৪.২ শিক্ষার লক্ষ্য ও তার শ্রেণিবিভাগ (Educational Objectives and its Classification)

শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ্যের শ্রেণিবিভাজন নিয়ে প্রথম প্রয়াস শুরু করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. বেঞ্জামিন ব্লুম (Dr. Benjamin Bloom)। তিনি পঠনপাঠনের মধ্যে শিক্ষার্থীর মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সঞ্চালনমূলক আচরণের পরিবর্তনের ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্য তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেন।

এই তিনটি শ্রেণিকে তিনি এক একটি বর্গ বলে আখ্যা দেন। সেগুলি হল ঃ

(ক) জ্ঞানবর্গ (Cognitive domain)

(খ) প্রক্ষোভ বর্গ (Affective domain)

(গ) সঞ্চালন বর্গ (Psycho-motor domain)

পরবর্তী স্তরে এদের নিয়ে আলোচনা করা হল।

৯.৪.৩ জ্ঞানবর্গের লক্ষ্য সমূহ (Objectives Under Cognitive Domain)

জ্ঞানবর্গের অধীনে যে সমস্ত শিক্ষার লক্ষ্যের উল্লেখ আছে তাতে চিন্তন, আগমন, সমস্যার সমাধান ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়ার শ্রেণি বিন্যাস আছে। এক কথায় স্মৃতি ও বুদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়বস্তু এই বর্গের অন্তর্গত। ছয়টি প্রধান শ্রেণির লক্ষ্য এই বর্গের অন্তর্গত। এই ছয়টি লক্ষ্য সহজ থেকে জটিল এই ধরনের বিষয়বস্তু দ্বারা ক্রমোচ্চ শ্রেণিতে বিন্যাস করা থাকে। ছয়টি লক্ষ্য হল—

(১) **অবগতি** (Knowledge) ঃ সংজ্ঞা, ঘটনা, নিয়ম, নীতি, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, সময়কাল ইত্যাদি নানান্ বিষয় স্মৃতিতে সংরক্ষণ করাকে বলা হয় অবগতি। অবগমন বোধ অর্থাৎ অবগত হওয়ার প্রক্রিয়া হল জ্ঞানমূলক লক্ষ্যের নিম্নতম স্তর। অবগমনের সর্বোচ্চ স্তর হল, বিষয়বস্তুর সার্বিকতা ও বিমূর্ত অবগমন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমস্ত পাঠে উপযুক্ত বিষয়ের সমাহার ও বিন্যাস করা হয়।

(২) **বোধ** (Comprehension) ঃ স্মৃতিতে সঞ্চিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবধারণ না হলে, শিক্ষার্থী অন্তর্নিহিত তথ্য ও তাৎপর্য বুঝতে না পারলে স্মৃতিতে জ্ঞানের সঞ্চয়ের ফলাফল বৃথা হয়। কোনো বিষয়ের ভাবার্থ করা, বাক্যরচনা করা, অনুবাদ করা ইত্যাদি সবই শিক্ষার্থীর 'বোধ' শক্তির পরিচয়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাঠক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

(৩) **প্রয়োগ** (Application) ঃ এই স্তরে পূর্ব পাঠে অর্জিত বা অধীত নিয়মনীতি, কার্যক্রম বা সাধারণ তত্ত্ব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে কতটা কাজে লাগাতে পারে তা জানার জন্য বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতা পাঠক্রমে যুক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রাথমিক স্তরে যোগ-বিয়োগ করার অভিজ্ঞতা কীভাবে শিক্ষার্থী বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজে লাগাতে পারে তা জানার জন্য এই স্তরে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অথবা শিক্ষণের বিভিন্ন সূত্র শিক্ষার্থীর পঠনপাঠন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা যাবে তা জানা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে। অথবা ক্ষেত্রফল শিখে খেলার মাঠ মাপা ইত্যাদি।

(৪) **বিশ্লেষণ** (Analysis) ঃ শিক্ষার এই উচ্চতর লক্ষ্য পূর্ববর্তী লক্ষ্যগুলি অর্জনের মধ্যে দিয়ে পূরণ করা হয়। পাঠক্রমে সরল তথ্য যেমন থাকে তেমনি ক্রমশ জটিলতার ধারণা ধাপে ধাপে শিক্ষাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। জটিল ধারণার অবধারণের জন্য বিশ্লেষণ অপরিহার্য। সহজ কথায় পাঠক্রম রচনা করার সময় সরল থেকে জটিল ধারণার যে নীতির কথা বলা হয়েছে তা শিক্ষার বিশ্লেষণাত্মক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যেই।

(৫) **সংশ্লেষণ** (Synthesis) ঃ বিশ্লেষণের বিপরীত প্রক্রিয়া হল সংশ্লেষণ। কোনো ধারণার উপাদানগুলিকে একত্র করে একটি ধারণার সংহত ও সংগঠিত রূপ দেওয়া হল সংশ্লেষণ। প্রাথমিক পর্বে ভাবার্থ লেখা, রচনা ইত্যাদি এই লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো গবেষণার ছক নির্মাণ এই লক্ষ্যের আওতায় পড়ে।

(৬) **মূল্যায়ন** (Evaluation) ঃ জ্ঞানমূলক লক্ষ্যের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে মূল্যায়ন। কোনো ধারণা, যুক্তি, পরিকল্পনা, কোনো বিষয়ের যথার্থতা, গুণাগুণ ইত্যাদি বিষয়ে বিচার করার প্রক্রিয়া এই ধরনের বিষয়বস্তু বা অভিজ্ঞতা দ্বারা পাঠক্রমে যুক্ত করা হয়। শিক্ষার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে এই যথার্থতা বিচার করা সবচেয়ে উন্নত পর্বের জ্ঞান আহরণ স্তর। এই জন্য পাঠক্রমে এমন অভিজ্ঞতা ও কার্যপ্রণালী অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাতে শিক্ষার্থী কোনো তত্ত্ব বা তথ্য নির্বিচারে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। পাঠক্রমে কোনো কবিতা মুখস্থ করার কাজ হল অবগতি, তার অর্থ ব্যাখ্যা করা হল বোধ, একইরকম বা একইভাবের অন্য কবিতাকে চিহ্নিত করা হল প্রয়োগ, কবিতাটির শব্দ, ছন্দ, যতি ইত্যাদি ভাগ করার কাজ হল বিশ্লেষণ, কবিতার সৌন্দর্য বিচার করার কাজ হল মূল্যায়ন।

শিক্ষার জ্ঞানমূলক লক্ষ্যগুলি পরীক্ষার মাধ্যমে বা আদর্শগত নানান অভিজ্ঞতার মধ্যে মাপা যায়।

৯.৪.৪ প্রাক্ষোভিক বা অনুভবমূলক লক্ষ্য (Affective Domain)

শিক্ষার্থীর অনুভব, আবেগ, মূল্যবোধ (Values), প্রতিন্যাস (attitude) ইত্যাদি সঠিকভাবে বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটানো শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ১৯৬৪ সালে ক্র্যাথওয়েল (Krathwohl), ব্লুম (Bloom) এবং ম্যাসিয়া যৌথভাবে শিক্ষার প্রাক্ষোভিক বা অনুভব লক্ষ্যের শ্রেণি বিন্যাস করেন। এই লক্ষ্যগুলি জ্ঞানমূলক লক্ষ্যের মতো এত প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ হয় না। শিক্ষণ-শিক্ষা প্রক্রিয়ায় এই অনুভবমূলক লক্ষ্য নেপথ্যে বা পরোক্ষে সূক্ষ্মভাবে কাজ করে যা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। যদিও অনুভবমূলক লক্ষ্যগুলি সরাসরি পরীক্ষার ফলাফলে বোঝা যায় না।

অনুভবমূলক লক্ষ্য অর্জিত হয় শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের আত্মীকরণের মাধ্যমে। শিক্ষার ফলে

শিক্ষার্থীর মধ্যে যে স্থায়ী মূল্যবোধের পরিবর্তন আসে, পাঠক্রমে তাই রাখা হয় তারই সহায়ক বিষয় ও অভিজ্ঞতা। প্রক্ষোভমূলক লক্ষ্য মূলত পাঁচ ধরনের। নীচে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হল।

(১) **গ্রহণ বা মনোযোগদান** (Receiving or attending) ঃ কোনো উদ্দীপকে উপস্থিতি সম্বন্ধে যে সচেতনা শিক্ষার্থী লাভ করে তাই হল মনোযোগদান। সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগের মাধ্যমে পাঠ্যবস্তু গ্রহণ করা শিক্ষার প্রাথমিক শর্ত। পাঠক্রমে বিষয়বস্তু নির্বাচন ও উপস্থাপনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থী তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিষয়বস্তু মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়। পাঠ্য বিষয়ে সচেতনতা (Awareness), গ্রহণ মনস্কতা (Willingness to receive) এবং নিয়ন্ত্রিত মনোযোগ এসব ক্ষমতা এই পর্যায়ভুক্ত।

(২) **প্রতিক্রিয়াকরণ** (Responding) ঃ পাঠক্রমে উপাদানগুলি শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে সচেষ্ট হলে তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হবে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রত্যুত্তরদান অথবা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর প্রত্যুত্তর করা/বা প্রত্যুত্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করা। তাই পাঠক্রমে সেইসব অভিজ্ঞতাই নেওয়া হবে শিক্ষার্থীকে প্রতিক্রিয়া করতে ও প্রত্যুত্তর দানে আগ্রহী করে তুলতে। আসলে প্রত্যুত্তর দানে সম্মতি, প্রত্যুত্তর দানের ইচ্ছা ও প্রত্যুত্তর দানের সন্তুষ্টি সবই এই অনুভব লক্ষ্যের নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

(৩) **গুরুত্ব আরোপ করা** (Valuing) ঃ প্রতিক্রিয়াকরণ ও উত্তরদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা তার কাছে মূল্যবান। ফলে বিষয় ও পাঠক্রম তার কাছে গুরুত্বপর্ণ বলে বিবেচিত হবে। বিষয় নির্বাচনের সময় মনে রাখতে হবে যে পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে হবে।

(৪) **সংগঠিতকরণ** (Organization) ঃ পাঠক্রমে শিক্ষণীয় বিষয়ের বিভিন্ন তথ্য, তত্ত্ব বা সূত্র সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনে আনুগত্য বা মূল্যবোধ জন্মালে ধীরে ধীরে এগুলি একত্রে সংগঠিত হয়ে ব্যক্তির এক ধরনের নিজস্ব বিচারবোধ জন্মায়। যেমন পরিবেশ সচেতনতা বোধ থেকে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব, জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সংযুক্ত হয়ে ব্যক্তির মনে পরিবেশ সচেতনতার আকার নেয়। তখন ভালোমন্দ বিচার করা, খুঁটিনাটি সব লক্ষ্য করা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য জ্ঞানকে সংগঠিত করা, এইসব গুণাগুণ মূল্যবোধের পরম সংগঠনের প্রকাশ বলে মনে করা হয়।

(৫) **গুরুত্ববোধ ও পরম মূল্যবোধের মাধ্যমে চরিত্রায়ন** (Characterisation by a value or value complex) ঃ শিক্ষার অনুভবমূলক লক্ষ্যের চূড়ান্ত পরিণতি হল চরিত্রায়ন। অর্থাৎ যখন পাঠক্রমের জ্ঞান মানুষের জীবনচর্চা ও জীবনাদর্শে অঙ্গীভূত হয়, যেমন—স্বাস্থ্যচর্চার জ্ঞান হিসেবে হাত ধুয়ে খাওয়া। প্রাথমিক স্কুলের পাঠক্রমের বিষয় আমাদের প্রত্যেকের জীবনচর্চায় মিশে যায়। এই পর্যায়ে মানুষের

চরিত্রে একটি সামান্য মানসিক অবস্থা (Generalized set) তৈরি হয়ে যায়। যার ভিত্তি হল, পরমমূল্যবোধের একটি স্থায়ী সংগঠন। শিক্ষার্থীর জীবনে এই সর্বব্যাপ্ত মূল্যবোধ সৃষ্টি হলে, তা তার চরিত্রে অঙ্গীভূত হয়। সুতরাং আদর্শ পাঠক্রমের লক্ষ্য হবে জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্থায়ী চরিত্র গঠন।

৯.৪.৫ সঞ্চালন বর্গের লক্ষ্য (Objectives Under Psycho-motor Domain)

পাঠক্রমের সঞ্চালনমূলক লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাজন করেন এলিজাবেথ সিম্পসন (Elizabeth Simpson)। ১৯৭২ সালে জ্ঞানমূলক ও অনুভবমূলক লক্ষ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চালনমূলক শিখনও ততটা গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্চালনমূলক শিখন (Psychomotor learning) কথাটির অর্থ হল শরীরের পেশিগুলির সুসামঞ্জস্য ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন করার দক্ষতা অর্জন। নীচে সঞ্চালনমূলক লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাজন নিয়ে আলোচনা করা হল ঃ

(১) **প্রত্যক্ষণ** (Perception) ঃ পাঠক্রমে বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যাতে করে সকল ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা গ্রহণে প্রস্থ ও সক্রিয়তাতে সাহায্য করতে পারে। অর্থাৎ পাঠক্রমে অন্তর্গত বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রত্যক্ষণ সঞ্চালন বর্গের প্রথম স্তর।

(২) **প্রস্তুতি** (Set) ঃ সঞ্চালনমূলক লক্ষ্যের দ্বিতীয় স্তর হল প্রস্তুতি। অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনে শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করে তোলা। তাই প্রস্তুতি তিনপ্রকার যেমন—মানসিক, শারীরিক, ও প্রাক্ষোভিক হতে পারে। অর্থাৎ কোনো কাজ সম্পাদন করার জন্য পদ্ধতিকে জানা, তা সঠিকভাবে করা ও সেই সফলতা অনুভব করা।

(৩) **নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া** (Guided responses) ঃ পাঠক্রমে এমন নির্দেশ থাকা আবশ্যক যাতে শিক্ষার্থীকে কোনো অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে কী ধরনের সক্রিয়তা প্রয়োজন তা উদাহরণস্বরূপ পাঠক্রমে উপস্থাপিত করা। অর্থাৎ শিক্ষক বৃত্ত এঁকে দেখালে ছাত্র তা করতে পারবে।

(৪) **জটিল সক্রিয়তা** (Complex overt responses) ঃ কোনো কৌশল আয়ত্ত হলে শিক্ষার্থী স্বেচ্ছায় তা দক্ষতার সঙ্গে অনুরূপভাবে সম্পাদন করতে পারলে তাকে জটিল সক্রিয়তা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে পাঠক্রমে এই জটিল সক্রিয়তার বিষয়টি অভিজ্ঞতা হিসেবে পরিগণিত হয়। যেমন কম্পিউটারে key Board ও Mouse-এর ব্যবহার জেনে কোনো কিছু সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা।

(৫) **অভিযোজন** (Adaptation) ঃ কোনো সঞ্চালন কৌশল পাঠক্রমে আয়ত্ত হলে তাকে অনুরূপ ক্ষেত্রে বা বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারাকে অভিযোজন বলা হয়। সাধারণ উল বোনার সময়

'সোজা ও 'উলটো' এই দুই ধরনের ডিজাইন থেকে সোয়েটারে নানা নক্‌শা প্রস্তুত করা।

(৬) **সৃজন** (Origination) ঃ অভিযোজন আয়ত্ত হলে সঞ্চালনমূলক লক্ষ্যের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানো সম্ভব। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী পূর্বে শেখা একাধিক কৌশলের সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন কিছু তৈরি করবে। যেমন পিয়ানোর বিভিন্ন রাগ বাজানো শিখে এদের নিয়ে নতুন কোনো সুর সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

পাঠক্রম প্রস্তুতির ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণি বিন্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রেণি বিন্যাসের মাধ্যমে শিক্ষক যেমন জানেন তিনি কী পড়াবেন, কেমনভাবে পড়াবেন আবার পড়ুয়াও বুঝতে পারে পাঠমালা শেষে তার কী জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন হবে। তা ছাড়া পাঠক্রমের মূল্যায়নেও এর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনেক।

৯.৫ পাঠক্রম রচনা এবং সিস্টেম পদ্ধতি (Curriculum Development Process and Systems Approach)

৯.৫.১ সিস্টেম পদ্ধতির ধারণাগত ভিত্তি (Concept About System Approach)

পাঠক্রম একটি গতিশীল ও নিরন্তর প্রক্রিয়া। পাঠক্রম রচনার সময় যেমন তাত্ত্বিকজ্ঞানের প্রয়োজন তেমনি দরকার বাস্তব উপযোগিতা, সম্ভাব্য পরিস্থিতি, প্রয়োজনীয় উপাদান ও সম্পদ সম্বন্ধে বাস্তবসম্মত ধারণা। দেখা গেছে বেশিরভাগ সময়ে পাঠক্রম রচনার সময় বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন ও চাহিদা/পরিস্থিতিভিত্তিক তথ্যের ঘাটতি থাকায় অনেক ক্ষেত্রে পাঠক্রম শিক্ষার্থীর জীবন বা জীবিকা অথবা সমাজের চাহিদাভিত্তিক হতে পারে না। অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাঠক্রম ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। পাঠক্রম প্রস্তুতির ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা দূর করার উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে পাঠক্রমের সিস্টেম পদ্ধতি। পাঠক্রমে সিস্টেম পদ্ধতি হচ্ছে একগুচ্ছ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উপাদান ও পরিস্থিতি, যারা সম্মিলিতভাবে কোনো কাজকে সম্পূর্ণতা দান করে। ব্যাঙ্গার্ব (1969)-এর মতে সিস্টেম হতে পারে একটি সুসংগঠিত পারস্পরিক ক্রিয়াশীল উপাদান সমূহের সমষ্টি যা সহযোগিতার ভিত্তিতে পূর্ব নির্দিষ্ট কাজ করে। এ. কে. জালালউদ্দিন সিস্টেমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন সিস্টেম হল একটি গতিশীল জটিল সামগ্রিক একক যা পাঠক্রমের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত স্বাধীন উপাদানসমূহকে পূর্বনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে সুসংগঠিত করে আরও কার্যকরী রূপ দিতে সাহায্য করে। এই ধারণা অনুযায়ী সিস্টেম পদ্ধতিতে তিনটি মুখ্য বিষয় বেছে নিতে হয়। এগুলি হল—

(১) যে-কোনো সিস্টেমে কতগুলি অংশ রয়েছে। এই অংশগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। এরা পাঠক্রমে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ না করে সম্মিলিতভাবে কাজ করে।

(২) পাঠক্রম যেহেতু কোনো কাজ/লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে তাই সিস্টেমের প্রতিটি অংশের লক্ষ্য ও গতিপথ সে কাজের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ও ক্রিয়াশীল হবে।

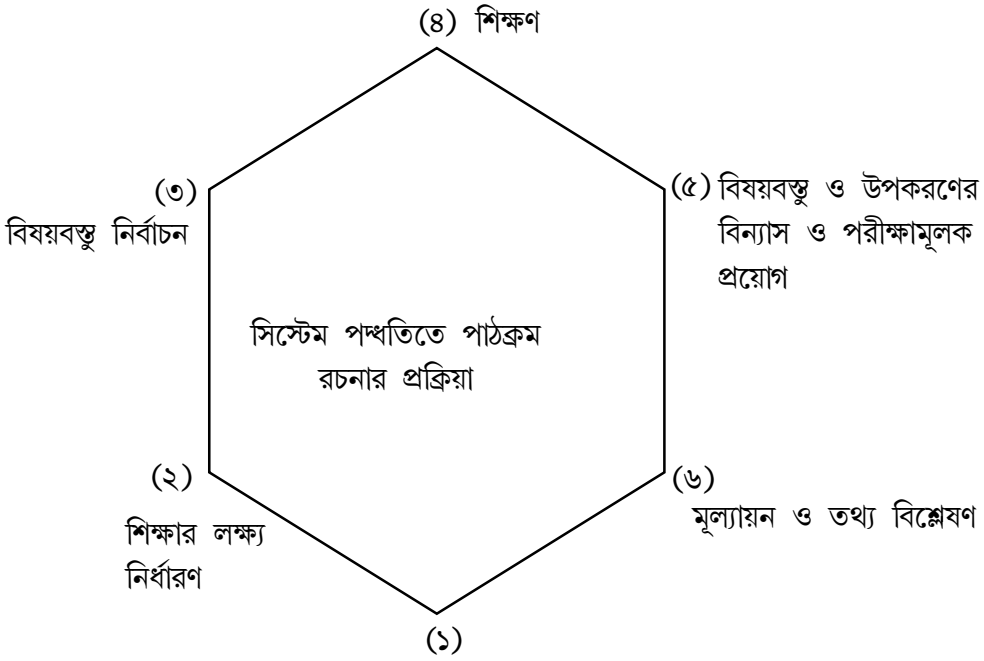

চিত্র ৯.২ সিস্টেম পদ্ধতিতে পাঠক্রম রচনার প্রক্রিয়া।

(৩) প্রতিটি সিস্টেম কোনো একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্রিয়াশীল থাকে তাই সেই পরিবেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে সিস্টেমের বিভিন্ন অংশের কার্যপ্রণালী ও সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, মানবদেহে যে পরিপাক সিস্টেম রয়েছে যার কোনো একটি সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা দেহের পুষ্টি ও পরিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। তেমনি সিস্টেম পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য, পরিবেশ ও চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উপাদান, শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন, নিরন্তর মূল্যায়নভিত্তিক পাঠক্রমের পরিমার্জনা, পরিবর্ধন ইত্যাদি অনেকগুলি অংশের সমন্বয়ে একটি সিস্টেম নির্মিত হয়।

(৪) পাঠক্রমে সিস্টেম অনুযায়ী বিভিন্ন অংশ পরিবর্তনশীল, নমনীয় এবং গতিশীল হয়ে শিক্ষার মূল লক্ষ্যে উপনীত হবার চেষ্টা করে।

৯.২ চিত্রে পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে সিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে ছক আকারে দেখানো হল।

৯.৫.২ সিস্টেম পদ্ধতিতে পাঠক্রম রচনার পর্যায়ক্রম (Steps of Curriculum Development in Systems Approach)

সিস্টেম পদ্ধতির সময়ে বিভিন্ন বিষয় ও উপাদান কীভাবে কাজ করে থাকে তা পর্যায়ক্রমে নীচে দেখানো হল ঃ

পর্যায়-১ ঃ পরিস্থিতি ও চাহিদা বিশ্লেষণ ঃ পাঠ্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পাঠক্রম সমাজের চাহিদা ও শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুত হওয়ার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এই চাহিদার বিচার হবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাই পাঠক্রম রচনার সময় প্রথম কাজ হল চাহিদার বিশ্লেষণ। আর কোন্ কোন্ চাহিদা পাঠক্রমে স্থান পাওয়ার যোগ্য তা স্থির করা এবং চাহিদার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির গুরুত্ব নির্ণয় করা।

পর্যায়-২ ঃ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ ঃ এই পর্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখানে পাঠক্রম রচয়িতাদের পাঠক্রমের চাহিদা ও বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষার তাৎক্ষণিক ও চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ণয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এই পর্যায়ে পাঠক্রম রচনার নীতি যেমন স্থির হয় তেমনি চাহিদা, পরিস্থিতি ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে পাঠক্রমের কাঠামোও স্থির করা হয় এই দ্বিতীয় পর্যায়ে।

পর্যায়-৩ ঃ বিষয়বস্তু নির্বাচন ঃ এই পর্যায়ে পাঠক্রমের খুঁটিনাটিসহ খসড়া রচনা করা হয়। একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করার অর্থ এই নয় যে কয়েকটি পাঠ্য বিষয়কে নিছক তালিকাভুক্ত করা শিক্ষার মূল লক্ষ্য, তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়, কার্যক্রম ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যুক্ত করার তালিকা প্রস্তুত হয় এই পর্যায়ে।

পর্যায়-৪ ঃ শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন ঃ ৩য় পর্যায়ে তৈরি করা খসড়া শিক্ষণের পদ্ধতি, সময়কাল, কৌশল ও উপকরণের বিচারে এখানে পরিমার্জন করা হয়। তা ছাড়া পঠনপাঠনের সময় কী কী বিষয় অন্তরায় হতে পারে সেই অনুযায়ী কী কী পরিবর্তন করা দরকার তা বিচার করে খসড়াটি আরও উন্নতমানের করার চেষ্টা হয়।

পর্যায়-৫ ঃ বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ঃ আদর্শ সিস্টেম পদ্ধতিতে পাঠক্রমটি পরীক্ষামূলকভাবে শিক্ষার্থীদের ওপর প্রয়োগ করার কাজ করা হয়। এই পর্যায়ে তাই বিষয়বস্তু নানান বিকল্প বিন্যাসের মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্যতা বেশি তা স্থির করা হয়।

পর্যায়-৬ ঃ মূল্যায়ন ও তথ্য বিশ্লেষণ ঃ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও নানা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মূল্যায়ন ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই স্তরে বিষয়বস্তুর পরিমার্জনা, সংশোধন ও পরিবর্ধন করা এই পর্যায়ে শুরু হয়। প্রাপ্ত সংস্কার ও পরিমার্জনার পর প্রথম পর্যায়ে আবার ফিরে যাওয়া হয়।

৯.৬ উপসংহার (Conclusion)

এই অধ্যায়ে পাঠক্রম রচনার রীতিনীতির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির ভারসাম্য রেখে পাঠক্রম রচনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হল। সাধারণভাবে পাঠক্রমের লক্ষ্য সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও শিখনের নানা তত্ত্বের সঙ্গে সংমিশ্রণ করে গড়ে উঠেছে পাঠক্রমের বিষয় বিন্যাসের নীতি ও বিষয় নির্বাচনের নীতি। **বিষয় নির্বাচনের** ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শিশুকেন্দ্রিকতা, সমাজকেন্দ্রিকতা, সৃজনশীলতা, সমাজের সংরক্ষণতা ও অগ্রমামিতা ইত্যাদি দিক, তেমনি বিষয় বিন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ের বা সমাহারের সঙ্গে তাদের সক্রিয়তা ও নমনীয়তার দিকে অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা। তা ছাড়া পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচন করার সময় শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণিবিভাজন—জ্ঞানবর্গ, প্রক্ষোভবর্গ ও সঞ্চালন বর্গের শ্রেণি বিন্যাসের মাধ্যমে শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে পঠনপাঠনের বিষয় নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন। পাঠক্রম রচনা করা একটি দীর্ঘকালীন ও দলবদ্ধ কাজ। তাই সিস্টেম পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠক্রমে বিষয়বস্তু নির্বাচন, পদ্ধতি ও উপকরণ ঠিক করা, মূল্যায়ন ও তথ্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

৯.৭ প্রশ্নাবলি (Questions)

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay type Questions)

১। পাঠক্রম রচনার মূল নীতিগুলি আলোচনা করুন।

২। পাঠক্রম বলতে কী বোঝায়? পাঠক্রমে উপাদান নির্বাচনের মূলনীতিগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৩। শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাজন বলতে কী বোঝায়? এই শ্রেণি বিভাজন মূলত কারা উপস্থাপিত করেছেন? সংক্ষেপে শিক্ষার লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাজন নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। জ্ঞানবর্গ ও প্রক্ষোভ বর্গ অনুযায়ী শিক্ষা লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাজন নিয়ে আলোচনা করুন।

৫। শিক্ষার লক্ষ্যের প্রক্ষোভ বর্গ ও সঞ্চালন বর্গের শ্রেণি বিভাজন বলতে কী বোঝায়? এই দুই লক্ষ্যের শ্রেণি বিভাজন বিবৃত করুন। এদের উপযোগিতা উল্লেখ করুন।

৬। পাঠক্রম প্রস্তুতির জন্য যে যে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তা সবিস্তারে আলোচনা করুন।

৭। সিস্টেম পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? সিস্টেম পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন। সিস্টেম পদ্ধতিতে পাঠক্রম রচনার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৮। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

(ক) পাঠক্রমে উপাদান নির্বাচনের নীতি।

(খ) জ্ঞানবর্গের শ্রেণি বিন্যাস।

(গ) পাঠক্রম ও প্রক্ষোভ বর্গের লক্ষ্য।

(ঘ) পাঠক্রমে উপাদানের বিন্যাসনীতি।

(ঙ) সিস্টেম পদ্ধতিতে পাঠক্রম রচনা।